POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء:42)

অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব?

(সূরা নিসা, আয়াত: ৪২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 34

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 20 ই আগস্ট, 2020 ● 29 যুল হাজ্জা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আযানের গুরুত্ব ও কল্যাণ

● হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা আযানের ধ্বনি শুনতে পাও, তখন মুয়াজ্জিন বা আহ্বানকারী যা বলে, তোমরাও সেই একই বাক্য উচ্চারণ কর।

● হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এই দোয়া পাঠ করেছে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ

এমন ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হবে।

● হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আযান এবং প্রথম সারিতে কি (পুণ্য) রয়েছে যদি তা লোকেরা জানত, লটারি করে ভাগ্য নির্ধারণ করা ছাড়া তাদের আর উপায় থাকত না। আর যদি লোকেরা জানত যে প্রথম সময়ের যোহরের নামাযে কি (পুণ্য) রয়েছে, তবে তারা হুড়োহুড়ি করে এর দিকে দৌড়ে আসত। আর যদি জানত যে এশা ও যোহরের নামাযে কি (পুণ্য) রয়েছে তবে পা ঘসে ঘসে হলেও নামাযে আসত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের চিরন্তন সত্যগুলি কুরআন করীমে বিদ্যমান

কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিজের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি করাই সহজতম কাজ। সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীরা চিরকাল আপত্তি পর্যন্তই নিজেদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে, বিরোধীতায় কখনও এমন কোনও দৃঢ় কাজ করতে পারে না যার দ্বারা তাদের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। অনুরূপ অবস্থা কুরআন করীমের বিরোধীদের ছিল। তারা কুরআন করীমের উপর আপত্তি করত ঠিকই, কিন্তু এর বিপরীতে এমন কোনও শিক্ষা উপস্থাপন করত না যা তার সমকক্ষও হতে পারে, তার থেকে উন্নত হওয়া তো অনেক দূরের বিষয়। আজও পর্যন্ত কুরআন করীমের

এরপর শেষের পাতায়...

খোদা তা'লা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতিই উৎসর্গিত হও। এই জগত তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য যেন না হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য

অতএব, তোমাদের জন্য একথা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে খোদা তা'লা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতিই উৎসর্গিত হও। এই জগত তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য যেন না হয়। আমি বারংবার এই বিষয়টিকেই তুলে ধরি কেননা আমার মতে এটিই সেই কারণ যার জন্য মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আর এই নির্দেশ থেকেই মানুষ দূরে সরে গেছে। আমি একথা বলছি না যে তোমরা জাগতিক কাজকর্ম ত্যাগ করে দাও, বা স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পৃথক হয়ে কোন অরণ্যে কিম্বা পর্বতে গিয়ে জীবন যাপন কর। ইসলামে এর বৈধতা নেই, সন্ন্যাসব্রতও ইসলাম অনুমোদিত নয়। ইসলাম মানুষকে সক্রিয়, বিচক্ষণ এবং সক্ষম করে তুলতে চায়। এই জন্য আমি বলি যে তোমরা কঠোর পরিশ্রমসহকারে নিজেদের কাজকর্ম কর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যার কাছে চাষের জমি আছে অথচ সেটিকে সে কৃষিকাজে ব্যবহার করে না, খোদার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব কেউ যদি এর দ্বারা এই অর্থ বের করে যে জাগতিক কাজকর্ম থেকে তার পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত, তবে সে ভুল করছে। এমনটি মোটেই নয়। বরং যে সমস্ত কাজকর্ম তোমরা কর সেগুলির মধ্যে যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি থাকে, সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখো। আর তাঁর ইচ্ছার বাইরে নিজের লক্ষ্য ও আবেগকে অগ্রাধিকার দিও না।

অতএব, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানো, এবং খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নিদ্রাযাপনই যদি জীবনের উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত সফলতা হিসেবে গণ্য হয়, অপরদিকে হৃদয়ে খোদার জন্য কোনও স্থান অবশিষ্ট না থাকে, তবে স্মরণ রেখো, এমন ব্যক্তি সেই সকল বৈশিষ্ট্যাবলী হারিয়ে ফেলে যেগুলি দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। অবশেষে এমন ব্যক্তি ক্রমশ নিজের শক্তিবৃত্তি ও কার্যক্ষমতা হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়বে। স্পষ্ট কথা এই, যে উদ্দেশ্যে আমরা কোনও জিনিস সংগ্রহ করি, যদি তা সেই কাজটিই না করে তবে আমরা সেটিকে অকেজো আখ্যা দিই। যেমন কুর্সি বা টেবিল তৈরীর জন্য একটি কাঠের টুকরো নেওয়ার পর যদি সেটি ব্যবহারের অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে সেটিকে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করব। অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, কিন্তু সে যদি বাহ্যিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের দরুন নিজের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করে অকেজো করে ফেলে, তবে খোদা তা'লা তার পরোয়া করেন না। এই বিষয়ের প্রতিই এই আয়াতটি ইঙ্গিত করছে।- قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ। (আলফুরকান: ৭৮) আমি একবার পূর্বেও বর্ণনা করেছিলাম, একবার স্বপ্নে দেখি,'আমি একটি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যার পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি লম্বা খাল প্রবাহিত হয়েছে। সেই খালের পাড়ে অনেকগুলি মেষ শুইয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক মেষকে ঘাড়ে ছুরি রেখে ফেলে রেখেছে একজন করে কসাই আর সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমি তাদের কাছেই পায়চারি করছি। এই দৃশ্য দেখে আমি অনুধাবন করলাম যে তারা স্বর্গীয় নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। সেই সময় আমি এই আয়াতটি পাঠ করলাম-قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ তারা আমার মুখ থেকে এই আয়াত শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ ছুরি চালিয়ে দিল এবং বলল 'তোমরা কি?' আবর্জনা ভক্ষনকারী মেষ ছাড়া কিছুই না।

অতএব, খোদা তা'লা মুত্তাকির জীবনের পরোয়া করেন এবং তার জীবন আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। আর যে ব্যক্তির তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পা বাড়ায়, তিনি তার পরোয়া করেন না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। কাজেই নিজেকে শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। যেভাবে ক্লোরোফর্ম মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, অনুরূপভাবে শয়তান মানুষকে ধ্বংস করে অবহেলার ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখে, আর এরই মধ্যে তাকে ধ্বংস করে দেয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:১৭০-১৭১, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (২)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকে বিভিন্ন স্থানে বিরুদ্ধবাদীদেরকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তাদের কারোর জন্য তিনি কখনও বা পুরস্কার ধার্য করেছেন আবার কখনও পুরস্কার ছাড়াই। তাঁর কতিপয় প্রতাপান্বিত চ্যালেঞ্জ অধ্যায়ন করে যে রোমহর্ষক অনুভুতি জাগে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চ্যালেঞ্জ এর জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধবাদীদেরকে অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা পরাস্ত করে তাদের পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে তুলে ধরা। বিগত সংখ্যায় (১৯ শে মার্চ এর সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আমরা বারাহীনে আহমদীয়া সম্পর্কে তাঁর দশ হাজার টাকার দাপুটে চ্যালেঞ্জের কথা জেনেছি। আজ আমরা আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘটনা বর্ণনা করব। এই চ্যালেঞ্জটিও তিনি বারাহীনে আহমদীয়ারই ৪৩৪ পৃষ্ঠায় পাদ্রী ইমাদুদ্দীনকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর উপর আপত্তি করার কারণে দিয়েছিলেন।

পাদ্রী ইমামুদ্দীন এর আপত্তি এবং এই প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দেওয়া উত্তর সম্পর্কে জানার আগে পাদ্রী সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করা সমীচীন হবে। ১৮৩০ সালে তাঁর জন্ম আর মৃত্যু ১৯০০ সালে। কুরআন, হাদীসের শিক্ষা লাভ, ফকির, আলেম, পুণ্যবানদের সান্নিধ্য লাভ এবং তাদের কাছ থেকে ধর্ম শেখার পর ১৮৬৬ সালের ২৯ শে এপ্রিল প্রায় ছত্রিশ বছর বয়সে অমৃতসরে পাদ্রী রবার্ট ক্লার্ক এর হাতে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। ইমাদুদ্দীন লেখেন- 'আমি কেবল নাজাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে খৃষ্টান হয়েছি।' খৃষ্টান হওয়ার পর ইসলামের বিরোধীতা, আঁ হযরত (সা.) কে গালি দেওয়া এবং কুরআন করীমের উপর আপত্তি করাই তার নিত্যদিনের কাজ হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তি কি নাজাতের আকাঙ্খী হতে পারে? পাদ্রী ইমাদুদ্দীন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মতামত দেওয়া হল-

একটি খৃষ্টান পত্রিকা 'শামসুল আখবার' (আমেরিকান মিশন প্রেস, ১৫ অক্টোবর, ১৮৭৫ এর সংখ্যায় প্রকাশিত) এ লেখা হয়-

"হিন্দুস্তান সরকারের অধীনস্থ সাগর মুলুক জেলার সহকারী যুগ্ম কমিশনার খৃষ্টান মুনসিফ সফদর আলি সাহেব বাহাদুর সম্পাদিত 'নিয়ায নামা' পত্রিকাটি ইমাদুদ্দীনের রচনাবলীর ন্যায় বিদ্বেষমূলক নয় যা কেবল গালাগালিতে পরিপূর্ণ। ১৮৫৭ সালের ন্যায় যদি পুনরায় আরও এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, তবে তার জন্য দায়ী থাকবে এই ব্যক্তির নোংরা ভাষা এবং কদর্যতা। যখন বাইরে পনেরো টাকার চাকরীতেও তাকে কেউ রাখতে প্রস্তুত ছিল না, এমতাবস্থায় মিশন তাকে সত্তর টাকা মাসিক হারে বেতন দেয় উপরন্ত বাস করার জন্য এমন বিশাল বাংলো দেয় যার মধ্যে তেলের কলু লাগানো যেতে পারে, এমন লালসাকে কিই বা বলা যায়!"

(নুরুল হক, প্রথম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪১)

সফদর আলি আগ্রায় থাকা কালে ইমাদুদ্দীনের বন্ধু ছিলেন। যেখানে ইমাদুদ্দীন তার বড় ভাই মৌলবী করীমুদ্দীনের তত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৭ সালের পর মৌলবী করীমুদ্দীন লাহোরে চলে এলে ইমাদুদ্দীনও লাহোরে চলে আসেন। এখানে তিনি সফদর আলীর খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়ে সংবাদ পান। এর কিছু কাল পর ইমাদুদ্দীনও খৃষ্টান হয়ে যান। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'বর্তমানে ব্রিটিশ ভারতে অনেক পাদ্রী এমন আছেন যাদের কাজই হল দিবারাত্র আমাদের নবী ও মৌলা হযরত মহম্মদ (সা.) কে গালি দিতে থাকা। গালি দেওয়ার কাজে প্রথম সারিতে রয়েছে অমৃতসরের পাদ্রী ইমাদুদ্দীন। (কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড-১২০)

তিনি (আ.) এমন পাদ্রীদের জন্য নুরুল হক পুস্তকে লেখেন-

" এই সব অন্নহীন, বস্ত্রহীন লোকেরা যারা নিজেদের খরচ নির্বাহ করতে অপারগ ছিল, আর মুসলমানেরাও তাদের অন্ন-সংস্থান করতে পারত না, তারা জগতের মোহ, সম্পদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের লোভে গীর্জাগুলিতে একত্রিত হয়েছে এবং নিজেদেরকে তারা ইসলাম বিদ্বেষী প্রমাণ করতে পবিত্রগণদের সর্দার আঁ হযরত (সা.)কে কদর্য ভাষায় গালি দেয় এবং যে কোনও উপায়ে নিজেদের কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে চাই। তাদের উচ্চপদস্থ নেতারা এদেরকে কর্পদকহীন করে রেখেছে, এই ধরণের কদর্য ভাষার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে কোনও পদক্ষেপ নেয় না। তাদেরকে আমার পরামর্শ এই সব লোকদের এমন সব কাজে নিযুক্ত করা উচিত যা জাতি ও পেশার বিচারে তাদের জন্য উপযুক্ত। তাদের মধ্যে যে কাঠমিস্ত্রী তাকে করাত দেওয়া হোক..... নাপিতকে খুর ও ব্লেড এবং তেলীকে একটা বড় মাপের কলু দেওয়া হোক। যাতে তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের যোগ্যতা মাফিক কাজে ব্যস্ত থাকে এবং এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা অনর্থক কথা বলা এবং অশ্লীল ও পাপযুক্ত কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।"

(তারুফ নুরুল হক, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড)

যার হাতে ইমাদুদ্দীন ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেছিল সেই পাদ্রী রবার্ট ক্লার্ক ছিলেন পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এর পিতা, যিনি অমৃতসরে পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যে তর্কযুদ্ধের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সে রবার্ট ক্লার্কের প্রকৃত সন্তান ছিল না, পোষ্যপুত্র ছিল। তার পিতা ছিলেন আফগানী। ইমাদুদ্দীন পূর্বপুরুষ হাঁসি শহরের অধিবাসী ছিলেন। তার দাদু মৌলবী মহম্মদ ফাযিল কোন এককালে হাসি শহর ছেড়ে পানিপতে এসে বসবাস শুরু করেন। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে কোন এক সময় ইমাদুদ্দীন আজমীরের জামে মসজিদের ইমাম হিসেবে থেকেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন: 'পাদ্রী ইমামুদ্দীন সাহেব, যিনি এককালে আজমীর শরীফের জামে মসজিদের খতীব ছিলেন, তিনি ইসলাম বিমুখ হয়ে খৃষ্টান হয়ে যান এবং এতটাই ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে পড়েন যে পরবর্তী কালে তার সারাটি জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই ব্যতীত হয়।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

এখন পাদ্রীর ইমাদুদ্দীনের আপত্তি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দেওয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। পাদ্রী ইমাদুদ্দীন নিজের 'হিদায়াতুল মুসলিমীন' নামক পুস্তকে আপত্তি তোলেন যে,

'আর রহমানির রাহীম' যা বিসমিল্লাহ্‌র একটি অংশ, এটি আরবীর বাগ্মী ও সাবলীল নিয়ম মেনে ব্যবহৃত হয় নি। যদি রহীমুর রহমান' হত তবে তা সাবলীল এবং সঠিক বিন্যাসক্রম হিসেবে গণ্য হত। কেননা খোদার নাম রহমান সেই রহমতের সাপেক্ষে যা সার্বজনীন আর রহীম শব্দটি রহমানের বিপরীতে সেই রহমতের জন্য ব্যবহৃত হয় যা সীমিত এবং বিশেষ। আর সাবলীল ভাষার ছন্দ প্রবাহিত হয় সীমিত থেকে প্রাচুর্যের দিকে, প্রাচুর্য থেকে সীমিতের দিকে নয়। (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তরে বলেন-

"যে বাণীর বাগ্মিতা ও রচনা শৈলীর ঔৎকর্ষ (ইসলামের) ঘোর বিরোধীতা সত্ত্বেও আরবী ভাষাভাষি সকলের কাছে স্বীকৃত ও সমাদৃত, যাদের মধ্যে বড় বড় কবিও ছিলেন, এমনকি বড় বড় বিরুদ্ধবাদী এই কালামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে আর তাদের অধিকাংশই যারা বাগ্মি ও সাহিত্যানুগ ভাষার নিয়ম ও ব্যাকরণ এবং বাগবৈশিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ছিলেন, তারা স্বীকার করেছিলেন যে কুরআনের বর্ণনা শৈলী মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে আর এটিকে এক মহান অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে বিশ্বাস করে এর উপর ঈমান এনেছিলেন; কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর সাক্ষ্যপ্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর যারা অভ্যন্তরীণভাবে কঠোর প্রকৃতির ছিলেন, যদিও তারা ঈমান আনেন নি, তথাপি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময় নিমগ্ন হয়ে তাদেরকে বলতে হয়েছে যে এটি এক মহান জাদু যার মোকাবেলা করা যায় না।.....

এই অলৌকিক বাণীর রচনা শৈলীর উপর এমন সব মানুষ আপত্তি তুলছে, যাদের মধ্যে এই জন সেই ব্যক্তি রয়েছে যে আরবীতে সঠিক ও সাবলীল দুটি বাক্য গঠন করারও যোগ্যতা রাখে না। আর যদি কোনও আরবী ভাষাভাষির মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আসে তবে ভাঙ্গচোরা, ব্যকরনহীন এবং ভুল বাক্য ছাড়া কিছুই বলতে পারবে না। কারো মনে সংশয় থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। .....

এছাড়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বিবেচনা করে দেখবে যে, এই গ্রন্থ এমন এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়েছে যে নিজেই সেই ভাষার মানুষ এবং 'সাবা মুয়ালেকা'র কবিগণ সহ আরবী ভাষাভাষির সকল মানুষ এর পরম ঔৎকর্ষকে স্বীকার করেছে। এক অজ্ঞ অনারব ও অস্পষ্টভাষীর প্রত্যাখ্যানে এমন প্রমাণসিদ্ধ বাণীও কি আপত্তি যোগ্য হতে পারে, যে আরবী বাক্যের গঠন ও রচনাশৈলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, যে আরবী ভাষার ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা কখনও্ই অর্জন করে নি, এমনকি কোন সাধারণ আরবী ভাষীর সঙ্গেও যে কথা বলতে পারে না? এমন মানুষের আস্ফালন তার নিজের অজ্ঞতারই প্রদর্শন করে এবং উপলব্ধি করে না যে আরবী ভাষাভাষির মানুষের সাক্ষ্যদানের বিরুদ্ধে এবং বড় বড় প্রসিদ্ধ কবিদের সাক্ষ্যদানের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনা করা বাস্তবে অজ্ঞতা এবং কুটিল প্রকৃতির নগ্নরূপ। (ক্রমশ.....)

জুমআর খুতবা

ইহুদীদের মধ্য থেকে দশ ব্যক্তি (অর্থাৎ দশ/বারজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও) যদি আমার ওপর ঈমান আনয়ন করতো তাহলেও আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা রাখতাম যে, পুরো জাতি আমাকে গ্রহণ করে নিত আর আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পেত।

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী এবং তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত মহান নেতা হযরত সাআদ বিন মুআয (রা.)এর পুণ্যময় জীবনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

আহযাবের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা এবং খোদার নির্দেশে অলৌকিকভাবে তাদের শাস্তি প্রাপ্তির বিশদ বিবরণ

মাননীয় আলি আহমদ সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত মুয়াল্লিম, শ্রদ্ধেয়া রফীকাঁ বিবি সাহেবা, মাননীয় হাজিয়া রুকাইয়া খালিদা সাহেবা (সদর লাজনা ঘানা) এবং মাননীয় শেখ মুবারক আহমদ (মুবাল্লিগ) সাহেবের স্ত্রী সুফিয়া বেগম সাহেবার মৃত্যু এবং তাঁদের প্রশসংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ। এছাড়াও আরও কয়েকজন মরহুমীনের জানাযা গায়েব [যারা হলেন, মাননীয় নাসের সাঈদ সাহেব, মাননীয় গোলাম মুস্তফা সাহেব, ডক্টর পীর মহম্মদ নকীউদ্দীন সাহেব এবং মাননীয় যুলফিকার আহমদ দামানিক সাহেব (মুরুব্বী ইন্ডোনেশিয়া)]

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১০ ই জুলাই , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১০ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় যেমনটি আমি বলেছিলাম, আহযাবের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.)-এর প্রতি বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি–সংক্রান্ত ঐশী নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। সে অনুসারে তাদের সাথে যুদ্ধ হয় আর যুদ্ধবিরতির পর তারা অর্থাৎ বনু কুরায়যা হযরত সা'দ (রা.)-এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কাজেই হযরত সা'দ (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এভাবে বলেছেন, "২০ দিন পর মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধের পর। কিন্তু এখন বনু কুরায়যার বিষয়টি মীমাংসা হওয়ার ছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করার মত ছিল না। তাই মহানবী (সা.) ফিরে এসেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে বলেন, তোমাদের কেউ ঘরে বিশ্রাম নিবে না বরং সন্ধ্যার পূর্বেই বনু কুরায়যার দুর্গে পৌঁছে যাবে। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বনু কুরায়যার নিকট একথা জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করেন যে, তারা কেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? বনু কুরায়যা লজ্জিত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করা কিংবা কোন অপারগতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা উল্টো হযরত আলী (রা.) এবং তার সঙ্গীদের কটুকথা শোনাতে আরম্ভ করে, এমনকি মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারের নারীদেরকেও গালমন্দ করতে থাকে। অধিকন্তু তারা বলে, 'মুহাম্মদ (সা.) কী তা আমরা জানি না, তার সাথে আমাদের কোনও চুক্তি নেই।' হযরত আলী (রা.) তাদের এই উত্তর নিয়ে ফিরে আসেন। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে ইহুদীদের দুর্গের দিকেই যাচ্ছিলেন। ইহুদীরা যেহেতু নোংরা গালমন্দ করছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী ও কন্যাদের ব্যাপারে অশোভনীয় কথা বলছিল তাই এসব কথা শুনে তিনি (সা.) কষ্ট পাবেন ভেবে হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন? এই যুদ্ধের জন্য আমরাই যথেষ্ট। আপনি ফিরে যান। মহানবী (সা.) বললেন, আমি জানি তারা গালাগালি করছে আর তুমি চাও না, এসব গালি আমার কর্ণগোচর হোক। হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! বিষয় তা-ই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তারা যদি গালি দেয় তাতে কী হয়েছে? মূসা (আ.) তো তাদের নিজেদের নবী ছিলেন, তাকেও তারা এর চেয়ে অনেক বেশি যাতনা দিয়েছে। একথা বলতে বলতে তিনি (সা.) ইহুদীদের দুর্গে চলে যান কিন্তু ইহুদীরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে এর ভিতরে নিজেদের অবরুদ্ধ করে নেয় এবং (এভাবে) তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। এমনকি তাদের মহিলারাও এ যুদ্ধে অংশ নেয়। দুর্গের প্রাচীর ঘেঁষে কয়েকজন মুসলমান বসে ছিলেন, এমন সময় এক ইহুদী মহিলা উপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে মেরে ফেলে। কিন্তু অবরুদ্ধ অবস্থায় কিছুদিন থাকার পর ইহুদীরা বুঝতে পারে, এভাবে তারা দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে তাদের এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, তিনি (সা.) যেন তাদের মিত্র ও অওস গোত্রের নেতা আবু লুবাবা আনসারীকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাকে পাঠিয়ে দেন। ইহুদীরা তার কাছে পরামর্শ চেয়ে বলে, তারা কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ দাবি মেনে নিবে যাতে তিনি বলেছেন তারা যেন তাঁর উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পন করে? ইহুদীরা এবিষয়ে জিজ্ঞেস করে। আবু লুবাবা (রা.) মুখে হ্যাঁ বললেও নিজের গলদেশে হাত চালিয়ে এমনভাবে ইশারা করেন যা হত্যার চিহ্ন নির্দেশ করে। মহানবী (সা.) তখনো নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি, কিন্তু আবু লুবাবা (রা.) মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাদের অপরাধের শাস্তি অর্থাৎ ইহুদীরা যে অপরাধ করেছে সেটির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে? তিনি কোন চিন্তাভাবনা না করেই ইঙ্গিতে তাদেরকে এমন একটি কথা বলে দেন যা পরিশেষে তাদের অর্থাৎ বনু কুরায়যা গোত্রের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তাই ইহুদীরা বলে বসে, 'মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে আমরা প্রস্তুত নই।' তারা যদি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হত। কিন্তু তাদের দূর্ভাগ্যের কারণে তারা বলে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত নই। বরং আমরা আমাদের মিত্র অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিব। তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা আমরা মাথা পেতে নিব। কিন্তু সেই মুহূর্তে ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয়। ইহুদীদের মাঝে কেউ কেউ বলে, আমাদের জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এটি পরিষ্কার আর মুসলমানদের আচার-আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তাদের ধর্ম সত্য। যারা মতবিরোধ করেছিল তারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যায়। সেই গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন হলেন আমর বিন সাওদা। স্বীয় জাতির লোকদেরকে তিনি ভর্ৎসনা করে বলেন, চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এখন হয় মুসলমান হও নয়তো কর দিতে সম্মত হয়ে যাও। ইহুদীরা বলে, আমরা মুসলমানও হব না আর করও দিব না, কেননা এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদের এমন বিষয় থেকে দায়মুক্ত হলাম। তাদেরকে বুঝানোর পরও যখন তারা বুঝল না তখন তিনি বলেন, তোমাদের এমন আচণের দায় আমার নয়, আমি আর তোমাদের সাথে নেই। এ কথা বলার পর তিনি দূর্গ থেকে বেরিয়ে যান। দূর্গ থেকে বের হওয়ার সময় মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের ছোট্ট একটি দল তাকে দেখে ফেলে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? উত্তরে তিনি নিজের পরিচয় দেন। একথা শুনে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ اِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ অথাৎ আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করেন, হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে ভদ্রলোকদের দোষত্রুটি গোপন রাখার

পুণ্যকর্ম থেকে কখনোই বঞ্চিত রেখো না। অর্থাৎ এ ব্যক্তি যেহেতু নিজের এবং নিজ জাতির কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত, তাই আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব হলো তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। এজন্য আমি তাকে গ্রেফতার না করে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সর্বদাই এমন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সৌভাগ্য দান করুন। নিপীড়ন ও নির্যাতনের কোন ইচ্ছাই ছিল না। এ ঘটনা জানার পর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) কে তিরস্কার করেন নি অথবা এ জবাবদিহিও করেন নি যে, তুমি কেন তাকে আটক কর নি আর এই ইহুদিকে তুমি কেন ছেড়ে দিয়েছ? বরং তিনি (সা.) তাকে এহেন কর্মের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। মহানবী (সা.) তার এই কাজের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ।

এসব ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের ঘটনা। জাতিগতভাবে তো বনু কুরায়যা নিজেদের হঠকারি সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। যদিও দু-একটি ঘটনা এমন ছিল বা কয়েকজন এমন লোক ছিল যারা বনু কুরায়যার সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিল না এবং তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইছিল, কিন্তু এগুলো ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের ঘটনা। জাতিগতভাবে তো তারা এ বিষয়ে হঠকারিতা দেখাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে অনড় ছিল যে, মহানবী (সা.) কে তারা বিচারক মানবে না। তারা এই মর্মে জোরাজোরি করতে থাকে যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত নয় বরং তারা সা'দ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত মানবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বিচারক মানতে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি তারা সা'দ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জেদ ধরে। মোটেও তারা মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য তাঁকে বিচারক মনোনীত করতে চাইছিল না। বরং তারা বলে, আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দিবে সা'দ। রসূলে করীম (সা.)ও তাদের এ দাবি মেনে নেন। যুদ্ধে আহত সা'দ (রা.) কে এই মর্মে সংবাদ পাঠানো হয় যে, বনু কুরায়যা তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত। অতএব তুমি এসে সিদ্ধান্ত প্রদান কর। এ প্রস্তাব ঘোষিত হতেই বনু কুরায়যার বহু পূর্বের মিত্র অওস গোত্রের লোকেরা সা'দ (রা.)-এর নিকট দৌড়ে যায় এবং জোরাজোরি করে বলতে থাকে, 'যেহেতু খাজরায গোত্র তাদের মিত্র ইহুদিদেরকে সব সময়ই শাস্তি থেকে রক্ষা করে আসছে, তাই আপনিও আজ আমাদের মিত্র গোত্রের স্বপক্ষে রায় দিবেন।' আহত হওয়ার কারণে সা'দ (রা.) বাহনে চড়ে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তার গোত্রের লোকেরা তার সাথে সাথে দৌড়ে যাচ্ছিল এবং সা'দ (রা.)-এর নিকট জোরালো দাবি জানিয়ে বলছিল, 'দেখুন! বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে আবার রায় দিবেন না যেন।' কিন্তু সা'দ (রা.) উত্তরে কেবল একথাই বলেন যে, যাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দেওয়া হয় সে আমানতদার হয়ে থাকে আর তাকে সততার সাথে রায় দেওয়া উচিত, তাই আমি সততার সাথেই রায় প্রদান করব।

সা'দ (রা.) যখন ইহুদি দুর্গে নিকট পৌঁছান তখন একদিকে বনু কুরায়যা দুর্গের প্রাচীর ঘেষে দাঁড়িয়ে সা'দ (রা.)-এর জন্য অপেক্ষা করছিল আর অপরদিকে মুসলমানরা বসেছিলেন। তাই সা'দ (রা.) প্রথমে স্বীয় জাতির কাছে জানতে চান, 'আপনারা কি অঙ্গীকার করছেন যে, আমি যে রায় দিব তা আপনারা মেনে নিবেন?' তারা সম্মতি জানালে সা'দ (রা.) বনু কুরায়যাকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনারা কি অঙ্গীকার করছেন, আমি যে সিদ্ধান্ত নিব তা আপনারা গ্রহণ করবেন?' তারা সম্মতি জানলে তিনি লজ্জাবনত দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করেন যেদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) অবস্থান করছিলেন আর নিবেদন করেন, 'এদিকে যিনি বসে আছেন তিনিও কি এই অঙ্গীকার করছেন?' অর্থাৎ তিনি মহানবী (সা.) দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না, কেননা তিনি লজ্জা ও ত্রপা অনুভব করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁকে বিচারক মানা হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করাও আবশ্যক ছিল। এজন্য দৃষ্টি অবনত করে অত্যন্ত নম্র ভাষায় জানতে চান, আপনিও কি অঙ্গীকার করছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তিন পক্ষের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার পর হযরত সা'দ (রা.) বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে রায় প্রদান করেন। বাইবেলে লিখা আছে,

'যখন তুমি কোন শহরে সেই শহরবাসীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হও, তখন প্রথমে তুমি তাদেরকে সন্ধির বার্তা দিও। এতে যদি তারা তোমার সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয় আর তোমার জন্য দুর্গের দরজা খুলে দেয় তাহলে সেই শহরের সকল মানুষ তোমার করদাতা হবে এবং তোমার সেবা করবে। কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে সন্ধি না করে বরং যুদ্ধ করে তাহলে তুমি তাদেরকে অবরোধ কর আর তোমার প্রভু প্রতিপালক খোদা তাদেরকে তোমার করায়ত্ত করে দেওয়ার পর তুমি সেখানকার প্রত্যেক পুরুষকে তরবারির ধারাল অংশে হত্যা কর কিন্তু মহিলা, বালক-বালিকা ও গবাদিপশু এবং যা কিছুই সেই শহরে থাকবে সেই পুরো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তুমি নিজের জন্য নিয়ে নাও। এরপর তুমি তোমার শত্রুর কাছ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তোমার প্রভু প্রতিপালক খোদা তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি ভোগ কর। এভাবেই তুমি সেই সব শহর যা তোমার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং সেই জাতিসমূহের শহরগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলোরও একই অবস্থা কর। কিন্তু এই জাতিসমূহের শহরগুলোতে যেগুলোকে তোমার প্রভু প্রতিপালক খোদা তোমার উত্তরাধিকার বানিয়ে দেন সেগুলোর সেই সমস্ত জিনিস যা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এমন কোনও জীবকে জীবিত রাখবে না। বরং তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশে হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষীয়দের পুরোপুরি ধ্বংস করে দিবে। যাতে তারা তাদের সে সমস্ত মন্দকর্মের অনুসরণে তোমাদের আমল করার শিক্ষা দিতে না পারে যা তারা তাদের উপাস্যের সাথে করত আর এর ফলে তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালক খোদার পাপী বলে সাবস্ত হও।"

এগুলো হলো বাইবেলের আয়াত আর হযরত সা'দ (রা.) এগুলো পাঠ করেন এবং এ অনুসারেই রায় প্রদান করেন। বাইবেলের এই সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইহুদীরা যদি জয়ী হত আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরাজিত হতেন তাহলে বাইবেলের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বপ্রথম সকল মুসলমানকে হত্যা করা হত, তা হোক পুরুষ, মহিলা কিংবা শিশু। যেভাবে ইতিহাস থেকে প্রতিভাত হয় যে, নারী, পুরুষ ও শিশুদের সবাইকে এক সাথে হত্যা করাই ইহুদীদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারা যদি তাদেরকে খুব বেশি ছাড়ও দিত তাহলেও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা তাদের সাথে দূরের দেশগুলোর ন্যায় আচরণ করত এবং সকল পুরুষকে হত্যা করত এবং নারী, শিশু ও সহায়-সম্পদ লুটে নিত। সা'দ (রা.) বনু কুরায়যার মিত্র এবং তাদের বন্ধুদের একজন ছিলেন। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, ইহুদিরা ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই সিদ্ধান্ত মানে নি যা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রাণ রক্ষা করত তখন তিনি (রা.) ইহুদীদের জন্য সেই সিদ্ধান্তই দিলেন যা হযরত মূসা (আ.) আগেই 'দ্বিতীয় বিবরণ' পুস্তকে এরূপ পরিস্থিতির জন্য দিয়ে রেখেছেন। কাজেই এ সিদ্ধান্তের দায়ভার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) অথবা মুসলমানদের ওপর কোনক্রমেই বর্তায় না। কেননা এটি তো তাদেরই ধর্মগ্রন্থসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল; বরং এর দায় বর্তায় মূসা (আ.), তওরাত এবং সেসব ইহুদীদের ওপর যারা হাজার বছর ধরে অন্যান্য জাতির সাথে এরূপ আচরণ করে আসছিল এবং যাদেরকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দয়ার প্রতি আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, 'আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা মানতে প্রস্তুত নই বরং আমরা (হযরত) সা'দের কথা মানব।' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মূসা (আ.) প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারেই সা'দ (রা.) রায় প্রদান করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের খ্রিষ্টানরা এ নিয়ে হইচই করে বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নাকি অত্যাচার করেছেন। খ্রিষ্টান লেখকরা কি এটি দেখে না যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্য কোন ক্ষেত্রে কেন অত্যাচার করেন নি? অন্য কোথাও তো কোন অত্যাচার পরিলক্ষিত হয় না! শত্রুরা বহুবার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও কৃপার সামনে নিজেদের সমর্পণ করেছে আর প্রত্যেকবারই তিনি (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটি-ই একমাত্র ঘটনা যেখানে শত্রু হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলেছে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানব না, বরং অন্য অমুক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানব। সেই ব্যক্তিও প্রথমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছিলেন যে, 'আমি যে রায় দিব তা আপনি মেনে নিবেন। ইতিহাস থেকে যেমনটি সাব্যস্ত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকেও অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি রায় প্রদান করেন বরং (এটি বলা সমীচীন হবে যে,) তিনি নিজে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নি

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা

ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

বরং সেই মূসার (আ.)-এর সিদ্ধান্তেরই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন যার উম্মত হওয়া দাবি ইহুদীরা করে। অতএব অত্যাচার যদি কেউ করেই থাকে তবে নিজেদের প্রাণের ওপর অত্যাচার করেছে সেই ইহুদীরা যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল! নির্যাতন যদি কেউ করেই থাকে তবে তা করেছেন মূসা (আ.) যিনি খোদার নির্দেশে অবরুদ্ধ শত্রুদের সম্পর্কে তওরাতে এই শিক্ষাই প্রদান করে রেখেছেন! এটি যদি নিপীড়ন হয়েই থাকে তবে সেই খ্রিষ্টান লেখকদের উচিত মূসা (আ.)-কে অত্যাচারী আখ্যা দেওয়া বরং মূসা (আ.)-এর খোদাকে নিপীড়ক আখ্যা দেওয়া যিনি তওরাতে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন।

আহযাবের যুদ্ধ শেষ হলে রসূলে করীম (সা.) বলেন, 'আজ থেকে মুশরেকরা আর আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না, এখন ইসলাম নিজেই উত্তর দেবে; আর এখন আমরাই সেই সব জাতির ওপর আক্রমণ করব, যারা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল।' বস্তুত এমনটি-ই হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মৃত্যু ছাড়া আহযাবের যুদ্ধে কাফেরদের এমন কি-ইবা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল? পরের বছর তারা আবারও প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারত, বিশ হাজারের স্থলে তারা চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজারের সৈন্যবাহিনীও নিয়ে আসতে পারত; বরং যদি তারা আরও ভালভাবে আয়োজন করতো তবে এক-দেড় লাখের সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসাও তাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু একটানা একুশ বছর চেষ্টা করার পর কাফেররা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে খোদা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আছেন, তাদের প্রতিমাগুলো মিথ্যে আর খোদাই হলেন এ জগতের একমাত্র স্রষ্টা। বাহ্যিকভাবে তারা অটুট থাকলেও তাদের মন শতধা বিভক্ত ছিল। বাহ্যত তাদেরকে তাদের প্রতিমাগুলোর সামনে সিজদা করতে দেখা গেলেও তাদের মন থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮২-২৮৭)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, কিছু লোক হযরত সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত মানার শর্তে দূর্গ থেকে নেমে আসে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দকে ডেকে পাঠালে তিনি একটি গাধায় চড়ে আসেন। যখন তিনি মসজিদের কাছে পৌঁছন তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে দাড়াও অথবা বলেছেন তোমাদের নেতাকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়াও।' এরপর তিনি বলেন, হে সা'দ! এরা আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হয়ে নেমে এসেছে। সা'দ তখন বল্লেন এখন তাদের ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত প্রদান করছি, তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা রয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে বন্দী করা হবে। তিনি (স.) বলেন, তুমি ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছ বা বলেন তুমি বাদশাহর ন্যায় সিদ্ধান্ত দিয়েছ অর্থাৎ তুমি রাজাদের ন্যায় সিদ্ধান্ত দিয়েছ। এটি বুখারীর বর্ণনা।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৮০৪)

এর আরো বিস্তারিত কিছু বিবরণ আছে, হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবও বিস্তারিত বর্ননা করেছেন, কিছু কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। বনু কুরায়যার প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেন, কম-বেশি ত্রিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর অবশেষে এ দুর্ভাগা ইহুদীরা এমন এক ব্যক্তিকে বিচারক মেনে দুর্গ ছেড়ে বের হতে সম্মত হল যিনি তাদের মিত্র হলেও তাদের অপকর্মের কারণে তাদের জন্য স্বীয় অন্তরে কোন দয়া-মায়া রাখেন নি। যদিও তিনি ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন কিন্তু তার হৃদয়ে 'রাহমাতুল্লিল আলামীনের' ন্যায় দয়ামায়া ছিল না। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, অওস গোত্র বনু কোরায়যার পুরনো মিত্র ছিল আর সে যুগে সা'দ বিন মুআয এই গোত্রের নেতা ছিলেন যিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে মসজিদের উঠানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই পুরনো মিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বনু কুরায়যা বলে, 'আমরা সা'দ বিন মুআযকে আমাদের বিচারক হিসাবে মেনে নিচ্ছি। তিনি আমাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই দিবেন, আমরা তা মেনে নেব।' কিন্তু যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, কতিপয় ইহুদী এমনও ছিলেন যারা জাতির এ সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করতেন না এবং নিজেদেরকে অপরাধী জ্ঞান করতেন এবং মনে মনে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী এরূপ তিনজন ব্যক্তি ছিলেন যারা স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মহানবী (স.)-এর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আরও এক ব্যক্তি ছিল, যে মুসলমান হয়নি, কিন্তু জাতির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এতটা লজ্জিত ছিল যে, বনু কুরায়যা যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত করল তখন তিনি বলেন, 'আমার জাতি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর আমি এই বিশ্বাসঘাতকতার অংশীদার হতে পারি না।' সেই ব্যক্তি মদীনা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যায়। কিন্তু জাতির অন্যান্য সদস্যরা শেষ পর্যন্ত হঠকারিতায় অনড় ছিল এবং সা'দকে নিজেদের বিচারক নিযুক্ত করার জন্য জোর দাবি করতে থাকে। যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদের এই অনুরোধ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি (সা.) কয়েকজন আনসার সাহাবীকে দিয়ে সা'দকে ডেকে পাঠান। হযরত সা'দ আসার সময় পথিমধ্যে তার গোত্রের কিছু লোক বারবার তার কাছে অনুরোধ করে যে, বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র তাই তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করো। খাজরায যেমন তাদের মিত্র বনু কায়নুকার সাথে কোমল ব্যবহার করেছিল তুমিও বনু কুরায়যাকে ছাড় দিবে এবং তাদেরকে কঠোর কোন শাস্তি দিও না। হযরত সা'দ বিন মুয়ায প্রথমে নীরবে তাদের কথা শুনতে থাকেন কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যখন জোর দেওয়া হয় তখন সা'দ বলেন, 'এটি এমন এক সময় যখন সা'দ সততা ও ন্যায়ের বিষয়ে কোন সমালোচকের সমালোচনায় কান দিবে না। এটি সেই সময় যখন সাআদ সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কার মানার জন্য প্রস্তুত নয় ।' হযরত সাআদ এর উত্তর শুনে তার গোত্রের লোকেরা চুপ হয়ে যায় ।

হযরত সা'দ যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছান তখন তিনি (সা.) সাহাবাদেরকে বলেন, তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও এবং তাকে বাহন থেকে নামতে সাহায্য কর। সা'দ যখন বাহন থেকে নেমে মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যান তখন তিনি (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, 'সা'দ! বনু কুরায়যা তোমাকে বিচারক মেনেছে, তাদের বিষয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত দিবে তারা তা মেনে নিবে।' এরপর সা'দ নিজের গোত্র আওসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা কি খোদাকে সাক্ষী রেখে দৃঢ় অঙ্গিকার করছ যে, বনু কুরায়যা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তই হবে তা মেনে নিবে?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ আমরা অঙ্গিকার করছি।' পূর্বেই আমি হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর উদ্ধৃতির প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছি। যাহোক, এরপর মহানবী (সা.) যেখানে বসে ছিলেন সা'দ সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই সাহেবও কি অঙ্গীকার করছেন (এখানে এভাবেই লেখা আছে) যে, সিদ্ধান্ত যা-ই হোক তিনি আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ আমি অঙ্গীকার করছি।

এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তির পর সা'দ তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে বলেন, 'বনু কুরায়যার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে আর তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে আর তাদের সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।' মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত শুনে অবলীলায় বলে ওঠেন, 'তোমার এ সিদ্ধান্ত খোদার এক অটল তকদীর।' তাঁর (সা.) এ কথার উদ্দেশ্য হলো, বনু কুরায়যা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, এতে ঐশী হাত কাজ করছে আর এজন্যই তাঁর দয়া ও মহানুভবতা এটিকে আটকাতে পারেনি। আর এটিই সত্য, কেননা বনু কুরায়যা আবু লুবাবাকে নিজেদের পরামর্শের জন্য ডাকা , আবু লুবাবার মুখ থেকে এমন কথা বের হওয়া যা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন আর বনু কুরায়যা মহানবী (সা.)-কে বিচারক মানতে অস্বীকার করা এবং আওস গোত্র মিত্র বলে তাদের সাথে তারা অনুগ্রহের ব্যবহার করবে, একথা ভেবে অওস গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মুআ'যকে নিজেদের বিচারক নির্ধারণ করা আর এরপর সত্য ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সা'দের এমন কঠোর ও অনমনীয় অবস্থান যেখানে মিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতার আবেগ-অনুভুতি মন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকেও এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা যে, সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন তা মেনে নিবেন– এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ নেহাত সমাপতন

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

হতে পারে না নিশ্চয় এর নেপথ্যে ঐশী তকদীর কার্যকর ছিল আর এই সিদ্ধান্ত মূলত সা'দের নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, এমন মনে হয় যে, বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ, অশান্তি ও অরাজকতা, খুনোখুনি ও হানাহানির কারণেই ঐশী আদালত থেকে এই রায় চূড়ান্ত হয়েছিল যে, তাদের যোদ্ধাদের যেন ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এ যুদ্ধ সম্পর্কে শুরুর দিকে মহানবী (সা.)-কে অদৃশ্যের সংবাদের আলোকে অবগত করা থেকে প্রতিভাত হয়, এটি একটি ঐশী তকদীর ছিল; কিন্তু খোদা তা'লা পছন্দ করেন নি যে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এই রায় কার্যকর হোক। এজন্য তিনি (আলাহ্) ঘটনা প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঐশী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এসব থেকে মহানবী (সা.)-কে পুরোপুরি পৃথ ক রেখেছেন এবং সা'দ বিন মু'আযকে দিয়ে এই রায় ঘোষণা করিয়েছেন। আর রায়টিও এমনভাবে করিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) এখানে মোটেই হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না; কেননা তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি সর্বান্তকরণে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। অতঃপর যেহেতু কেবলমাত্র মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনের উপরেই এই রায়ের প্রভাব পড়ত না বরং গোটা মুসলমান জাতির ওপরেই তা বর্তাত; তাই তিনি (সা.) যতই ক্ষমা ও দয়ার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুন না কেন, এক্ষেত্রে এই রায় পরিবর্তন করার মত অধিকার তাঁর আছে বলে তিনি (সা.) মনে করতেন না। এটিই ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল, এই ঐশী ক্ষমতায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর (সা.)-এর মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য উচ্চারিত হয়, 'কাদ হাকামতা বিহুকমিল্লাহ' অর্থাৎ হে সা'দ! নিঃসন্দেহে তোমার এই সিদ্ধান্ত নির্ঘাত ঐশী তকদীর বলে মনে হচ্ছে যা বদলানোর ক্ষমতা কারো নেই।

এই কথা বলে তিনি নীরবে সেখান থেকে উঠে শহরের দিকে চলে যান। তখন তাঁর (সা.) হৃদয় এ কথা মনে করে খুবই ব্যথিত হয় যে, একটি জাতি যাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্খা ছিল কিন্তু নিজেদের অপকর্মের দরুন ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত থেকে তারা ঐশী কোপানল ও শাস্তির শিকার হচ্ছে। আর এ প্রেক্ষাপটেই অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে তিনি বলেন, "ইহুদীদের মধ্য থেকে দশ ব্যক্তি (অর্থাৎ দশ/বারজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও) যদি আমার ওপর ঈমান আনয়ন করতো তাহলেও আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা রাখতাম যে, পুরো জাতি আমাকে গ্রহণ করে নিত আর আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পেত।" যাহোক, সেখান থেকে আসার সময় তিনি এই নির্দেশ দেন যে, বনু কুরাইযার পুরুষ এবং মহিলা আর শিশুদের যেন পৃথক করে দেওয়া হয়। সুতরাং দু'টি পৃথক দলে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসা হয় এবং শহরে পৃথক পৃথক দু'টি ঘরে তাদেরকে একত্রিত করা হয়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে আমল করে সাহাবীরা যাদের অনেকেই নিজেরাই ক্ষুধার্ত থেকে থাকবেন বনু কুরাইযাকে খাওয়ানোর জন্য প্রচুর ফল-ফলাদি সরবরাহ করে। বর্ণিত আছে, ইহুদীরা রাতভর ফল খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। পরের দিন প্রভাতে সা'দ বিন মুয়াযের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। মহানবী (সা.) কয়েকজন সক্রিয় ব্যক্তিকে এই কাজ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিযুক্ত করেন আর স্বয়ং নিজেও এর নিকটস্থ একটি স্থানে অবস্থান করেন, যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় কোন বিষয়ে যদি মহানবী (সা.)-এর দিকনির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে তিনি যেন দ্রুত নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। একই সাথে কোন অপরাধীর পক্ষ থেকে ক্ষমার আবেদন করা হলে তিনি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। যদিও বিচারকের দৃষ্টিকোণ থেকে সা'দের সিদ্ধান্তের ওপর আবেদন করার সুযোগ ছিলনা কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার-প্রধান হিসাবে তিনি (সা.) যে কারো ব্যাপারে বিশেষ কোন কারণের প্রেক্ষাপটে ক্ষমার আবেদন শুনতে পারেন বা গ্রহণ করতে পারেন। যাহোক তিনি দয়ার মূর্ত-প্রতীক হিসাবে এই আদেশও প্রদান করেন, অপরাধীদেরকে যেন এক এক করে পৃথক পৃথক হত্যা করা হয় অর্থাৎ, একজনকে হত্যার সময় দ্বিতীয় অপরাধী যেন কাছে না থাকে। সুতরাং প্রত্যেক অপরাধীকে যেন পৃথক পৃথক নিয়ে আসা হয় আর সা'দ বিন মুয়াযের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের হত্যা করা হয়।

বনু কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কোন কোন অমুসলিম ইতিহাসবিদ খুবই অন্যায়ভাবে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে বা আক্রমণ করেছে। তারা বলে, চারশ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তাই নাউযুবিল্লাহ তাঁকে যালেম এবং রক্তপিপাসু হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের একজন গবেষকের গবেষণা অনুযায়ী ১৬ বা ১৭ জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। কেউ কেউ এ সংখ্যা ১০০ লিখেছে, কেউ ৪০০ লিখেছে কেউ বেশিও লিখেছে কেউ হাজার বা ৯ শত লিখেছে। সংখ্যা যা-ই হোক সংখ্যা যেহেতু নির্দিষ্ট নয় তাই এটি গবেষণার দাবী রাখে। যাহোক ৪০০ হলেও এই আপত্তি তারা ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই করে থাকে। ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর সম্পর্কে পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ঐতিহাসিকও এই অপবাদ আরোপ করে থাকে। এই অপবাদের উত্তরে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, 'প্রথমত এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, বনু কুরায়যা সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্তকে অন্যায় সিদ্ধান্ত আখ্যা দেওয়া হয় তা সা'দ বিন মুয়াযের সিদ্ধান্ত ছিল, আদৌ সেটি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল না। এটি যেহেতু মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তই ছিলনা, তাই তাঁর ওপর আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ পরিস্থিতির নিরিখে এই সিদ্ধান্ত কোন ভ্রান্ত বা অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিলনা। তৃতীয়তঃ রায় প্রদানের পুর্বে মোহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে সা'দ যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেই অঙ্গীকার অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত মানা মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্য আবশ্যক ছিল। চতুর্থতঃ স্বয়ং অপরাধীরা সা'দের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করেছিল আর এতে তারা কোন ধরনের আপত্তি করেনি। এটিকে তারা নিজেদের জন্য একটি ঐশী তকদীর হিসেবে মেনে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় বিনা কারণে এতে হস্তক্ষেপের জন্য মহানবী (সা.)-এর দণ্ডায়মান হওয়ার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। সা'দের সিদ্ধান্তের পর এক্ষেত্রে তাঁর (সা.) কেবল এতটুকুই ভূমিকা ছিল যে, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রব্যাবস্থার অধীনে এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করানোর ব্যাবস্থা করবেন। আমি যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, এই রায় তিনি (সা.) এমনভাবে বাস্তবায়ন করিয়েছেন যে, এটিকে মহানুভবতা ও মমতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পূর্বে যতক্ষণ তারা বন্দি অবস্থায় ছিল, তিনি (সা.) তাদের থাকা-খাওয়ার সর্বোত্তম ব্যাবস্থা করেছিলেন। এরপর যখন সা'দের রায় কার্যকর করানো হচ্ছিল, তিনি (সা.) এমন পন্থায় সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করানোর ব্যাবস্থা করেছেন যাতে অপরাধীদের ন্যূনতম কষ্ট হয়। প্রথমত তিনি (সা.) তাদের আবেগ অনুভুতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্দেশ দেন, একজন অপরাধীকে হত্যার সময় অন্য অপরাধী যেন সামনে উপস্থিত না থাকে। এমনকি ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, যাদেরকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো, তারা হত্যার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত জানতেই পারত না যে, তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও যে অপরাধীর ব্যাপারে তাঁর (সা.) নিকট প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করা হয়েছিল, তিনি (সা.) তৎক্ষণাত তা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং তাদের স্ত্রী-সন্তান ও তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ারও আদেশ দিয়েছিলেন। এর চাইতে মহানুভবতা ও স্নেহশীল আচরণ একজন অপরাধীর সাথে আর কী হতে পারে? কাজেই, বানু কুরায়যার ঘটনার প্রেক্ষাপটে যেমন তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপনের বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকে না, পক্ষান্তরে প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এই ঘটনা তাঁর (সা.) উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, চমৎকার ব্যাবস্থাপনা এবং তাঁর স্বভাবগত ক্ষমা ও দয়ার এক জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

নিঃসন্দেহে সা'দের সিদ্ধান্ত একটি কঠোর সিদ্ধান্ত ছিল এবং মানবিকতা বাহ্যত এ ঘটনায় পীড়িত হয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো, এছাড়া বিকল্প কোন পন্থা অবলম্বনের কি কোন সুযোগ ছিল? যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, বনু কুরায়যার সম্পর্কে সা'দের সিদ্ধান্তটি যদিও কঠোর প্রকৃতির ছিল, কিন্তু উক্ত ঘটনা পরিস্থিতির শিকার ছিল। আর পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাধ্য হলে আর কিছুই করার থাকে না। এ কারণেই মার্গোলিস ঐতিহাসিক যে মোটেও ইসলামের মিত্র ছিল না, সেও এ ঘটনায় এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, সা'দ এর সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির বাধ্যবাধ্যকতার প্রেক্ষাপটে ছিল, তা ছাড়া কোন

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Asyea Khatun, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

উপায় ছিল না। অতঃপর সে লিখেছে, খন্দকের যুদ্ধের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ সাহেব (সা.)-এর দাবি ছিল, তারা কেবল ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপদ হয়েছিল আর তা বনু নাযীরেরই উত্তেজনামূলক প্রচেষ্টার ফল ছিল অথবা কমপক্ষে এটি মনে করা হত যে, এটি তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরিণতি ছিল। আর বনু নাযীরকে মুহাম্মদ সাহেব (সা.) কেবলমাত্র দেশান্তরিত করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, মুহাম্মদ সাহেব (সা.) কি বনু কুরায়যাকেও দেশান্তরিত করে নিজের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা এবং শক্তিকে বৃদ্ধি করবেন? দ্বিতীয়তঃ এখন যারা প্রকাশ্যে আক্রমণকারীদের সমর্থন করেছে তাদেরকে মদীনায় বসবাস করতে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। তাদেরকে দেশান্তরিত করা যেমন নিরাপদ ছিল না, তেমনি তাদেরকে মদীনায় বসবাস করতে দেওয়াও কম ভয়ঙ্কর ছিল না। সুতরাং তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তরই ছিল না।

অতএব, মার্গোলিস এটি লিখেছে। কাজেই সা'দ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল পুরোপুরি ন্যায্য এবং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের মানদন্ড অনুযায়ী। এছাড়া নিজের অঙ্গীকার থাকায় এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কতিপয় লোকের জন্য ছাড়া (ঢালাও ভাবে) অনুগ্রহ ও কৃপার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ মহানবী (সা.)-এর ছিল না। (এরপরও) যারাই অনুগ্রহের আবেদন করেছিল তাদের জন্য তিনি (সা.) সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। সার্বজনীন সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন না। কিন্তু ইহুদিরা যেহেতু মহানবী (সা.) কে বিচারক মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাই মনে হয় এ লজ্জায় তারা তাঁর (সা.) সমীপে অনুগ্রহের আবেদন খুব একটা করে নি। গুটি কয়েকজন করেছিল মাত্র। এটি স্পষ্ট যে, আবেদন ছাড়া তিনি কৃপা করতে পারতেন না। কেননা যে বিদ্রোহী ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য অনুশোচনাও করে না, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

আরেকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন আর তা হলো মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মধ্যে প্রাথমিক যুগে যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্তগুলোর মাঝে একটি শর্ত ছিল, ইহুদীদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ের মীমাংসা করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা করা হবে তাদেরই শরিয়ত অনুযায়ী অর্থাৎ ইহুদীদের শরিয়ত অনুসারে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই চুক্তির ভিত্তিতেই মহানবী (সা.) সর্বদা মূসায়ী শরিয়ত অনুযায়ী ইহুদীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। তওরাতে আমরা দেখতে পাই, বনু কুরায়যা যেসব অপরাধ করেছে সেগুলোর শাস্তি সম্পর্কে তাতে হুবহু সেসব কথাই লিখা আছে যার বাস্তবায়ন বনু কুরায়যাকে শাস্তি দেওয়ার সময় সা'দ বিন মুআয (রা.) করেছেন।"(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৯-৬১১)

যাহোক, বনু কুরায়যার বিষয়ের সাথে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর যতটা সম্পৃক্ততা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর স্মৃতিচারণ আরো কিছুটা বাকি রয়েছে তা আমি পরবর্তীতে বলব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব যারা বিগত কিছুদিনে ইন্তেকাল করেছেন এবং জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্। প্রথম জন হলেন, মোকাররমা হাজিয়া রুকাইয়া খালেদ সাহেবা। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘানার সদর ছিলেন। গত ৩০ জুন তিনি ৬৫ বছর বয়সে ঐশী নিয়তির অধীনে মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।** তার জরায়ুর ক্যান্সার হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সুস্থও হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেছিলেন কিন্তু এ বছরের মে মাসে পুনরায় তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে এবং হঠাৎ করে পুনরায় তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর গত ৩০ জুন তিনি ইন্তেকাল করেন। হাজিয়া রুকাইয়া খালেদ সাহেবা ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর ঘানার ওয়াহ অঞ্চলের এক আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মরহুম পিতা আলহাজ্ব খালেদ সাহেব ওয়াহ-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামের ইমাম ছিলেন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ মূর্তিউপাসক ছিল। তিনি এসব মূর্তিউপাসকদের মাঝে তবলীগ করে সেখানে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মরহুমার বাল্যকাল ওয়াহ-তেই কাটে। তিনি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, ভদ্র এবং নীতিবান মহিলা ছিলেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষিকা ছিলেন। কর্মস্থল এবং জামা'তের মধ্যেও তিনি অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বুস্তানে আহমদ-এ আহমদীয়া ইণ্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন এবং অনেক শিশুকে তিনি নিজের বাড়িতে রেখে বিনামূল্যে পড়াশোনা করাতেন। ২০১৭ সালে তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ্'র সদর নিযুক্ত করা হয়েছিল আর অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সদর থাকাকালীন অর্থাৎ আমৃত্যু এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘানার সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করাতেন। বর্তমানে কোভিড-এর কারণে যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যেও তিনি ইণ্টারনেটের মাধ্যমে তরবিয়তমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখেন এবং লাজনাদের তরবিয়তের জন্যেও কাজ করতে থাকেন। নিয়মিত নামায পড়ার ক্ষেত্রে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি সাগ্রহে বিভিন্ন পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করতেন, তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং রীতিমত চাঁদা পরিশোধ করতেন। মরহুমা একজন মূসিয়া-ও ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা এবং চারজন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এছাড়া তার পরবর্তী প্রজন্মকেও তার এসব পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

আজ দ্বিতীয় যে জানাযাটি পড়া হবে তার স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছি। তিনি হলেন, শ্রদ্ধেয়া সুফিয়া বেগম সাহেবা। তিনি ছিলেন আফ্রিকা, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা জামা'তের সাবেক মোবাল্লেগ মরহুম শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২৭ জুন ৯৩ বছর বয়সে ঐশী ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**। হযরত কাজী আব্দুস সালাম ভাট্টি সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া মোবারেকা বেগম সাহেবার কোল আলো করে তিনি ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত কাজী আব্দুর রহীম সাহেব (রা.)-এর পৌত্রী এবং হযরত কাজী জিয়াউদ্দীন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন। মরহুমা অসংখ্য গুণের অধিকারী এবং দোয়ায় অভ্যস্ত একজন মহিলা ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। তিনি তার সন্তান বরং সন্তানদের সন্তানের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ সম্পর্ক কীভাবে বজায় রাখতে হয়। মরহুমা মূসী ছিলেন। শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের সাথে এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে ছিল এবং এই ঘরে তার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে আর প্রথম স্বামীর ঔরসেও সন্তান ছিল। প্রথম স্বামীর নাম ছিল নাসীর আহমদ ভাট্টি সাহেব। যাহোক, বিভিন্ন দেশে সেবারত শেখ সাহেবের সাথে তিনি পরম বিশ্বস্ততার সাথে জীবনযাপন করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে শেখ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা ছাড়া তার নিজের সন্তানদের মধ্যে দু'জন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তান রয়েছে। তার এক ছেলে ফাহীম আহমদ ভাট্টি সাহেব এখানে আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এক পৌত্র সবূর ভাট্টি সাহেব জামা'তের মুরব্বী, তিনি ওকালতে তবশীর ইউকে-তে কর্মরত আছেন। আরেকজন পৌত্র আহমদ ফওয়াদ ভাট্টি সাহেব ওয়াকফে যিন্দেগী, কানো'র আহমদীয়া কলেজে তিনি সেবা প্রদানের তৌফিক পাচ্ছেন। এক পৌত্র খলীক ভাট্টিও পড়াশোনা শেষে জীবন উৎসর্গ করে রিভিও অফ রিলিজিওনে সেবা প্রদান করছেন। তার আরেক পৌত্র হলেন নাবীল ভাট্টি সাহেব, যে গত দু'বছর পূর্বে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল, তার জন্য মরহুমা অনেক দোয়া করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তাকে এই ছেলের আরোগ্য সম্পর্কে অবগতও করেন পরে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্যও দান করেন। কিন্তু সেই রোগের কারণে এখনো নাবীল ভাট্টির ছোটখাটো কিছু জটিলতা রয়েছে।

যুগ খলীফার বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন করে। (২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

আল্লাহ্ তাকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন আর সুফিয়া বেগম সাহেবা তার জন্য যেসব দোয়া করে গেছেন তা কবুল করুন। এই (ছেলেও) ওয়াক্‌ফ করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা একেও জামা'তের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত করুন আর তাকে ও তার সন্তানদেরকেও জামা'তের সেবক বানান।

তার (মরহুমার) মেয়ে ফরিদা শেখ সাহেবা বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আমাদের আম্মার গভীর ভালোবাসা ছিল। সর্বদা তাঁর ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, তাঁর কারণেই আমরা সবকিছু পেয়েছি আর সব কল্যাণ তাঁরই। একইভাবে আফ্রো-আমেরিকান বোনদের সঙ্গেও তার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাদের অনেক খেয়াল রাখতেন, তাদের অধিকাংশের প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল এবং রান্নাঘরে বসে অকৃত্রিমভাবে তার সাথে কথাবার্তা বলতেন, মনে হত যেন তারা এ পরিবারেরই অংশ।

অনুরূপভাবে তার বড় মেয়ে নঈমা শাব্বির সাহেবা বলেন, তিনি (মরহুমা) গভীর মমতাময়ী ও স্নেহশীল ছিলেন। পরম সহিষ্ণু এবং নিজেকে কষ্টে নিপতিত করে অন্যদের প্রতি যত্নবান এক নারী ছিলেন। আমাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন, (হুযূরকে) নিয়মিত চিঠি লিখতে বলতেন। নিজ সন্তানদের অনুকূলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া নিয়মিত পড়তেন। দরিদ্র ও এতিমদের প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। নিয়মিত চাঁদা ও সদকা প্রদান করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বিশেষ স্নেহবশে শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জামা'তের মোবাল্লেগ ছিলেন আর তার প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, (এদিকে মরহুমার) স্বামীও ইন্তেকাল করেছিলেন। বিয়ের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) শেখ সাহেবকে (তার) কোন জামা'তী কাজে খুশি হয়ে বলেন, আমি আপনাকে একটি পুরস্কার দিচ্ছি। পুরস্কারস্বরূপ তিনি (রাহে.) তাকে সুফিয়া বেগম সাহেবাকে দিয়েছিলেন আর শেখ সাহেবও এই পুরস্কারের মূল্যায়ণ করেন। তার সন্তানদের, অর্থাৎ তার সাবেক স্বামী যিনি যৌবনেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন তার সন্তানদের প্রতিও তিনি অনেক খেয়াল রেখেছেন। তার বড় পুত্র শামীম ভাট্টি সাহেব স্কুল এবং কলেজ জীবনে আমার সাথে পড়াশোনাও করেছেন। আমি দেখেছি, তিনি অর্থাৎ শেখ সাহেবও সেই সন্তানদের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন এবং উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু সাফিয়া বেগম সাহেবাও কর্মক্ষেত্রে এমনভাবে শেখ সাহেবের সঙ্গ দিয়েছেন যা একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর স্ত্রীর আবশ্যিক দায়িত্ব। খুব কম মোবাল্লেগের স্ত্রী-ই এভাবে দায়িত্ব পালন করে যেভাবে তিনি পালন করেছেন। মেহমানদের আতিথেয়তা নিঃস্বার্থভাবে করেছেন আর কখনোই অভিযোগ করেন নি। একইভাবে জামা'তের সদস্যদের জন্যেও অনেক দোয়া করতেন। যেসব মোবাল্লেগ তার অর্থাৎ শেখ সাহেবের অধীনে ছিলেন, তাদের সাথে এবং তাদের পরিবারবর্গের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করতেন। আমার খলীফা হওয়ার পর তাঁর সাথে আমার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর পরিচয়ও হয়। আমি তাকে দেখেছি, তিনি খিলাফতের একজন প্রেমিক ছিলেন আর এমন প্রেমিক ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষ খুব কমই চোখে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরবর্তী প্রজন্মকেও সর্বদা জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত রাখুন।

পরবর্তী জানাযাটি হলো অবসরপ্রাপ্ত মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ জনাব আলী আহমদ সাহেবের। তিনি ১৮ জুন তারিখে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**। তার পিতা হযরত মিয়া আল্লাহ্‌দিত্তা সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯০৩ সনে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জেহ্‌লাম সফরকালে নিজ গ্রাম থেকে দশ-বারো মাইল পায়ে হেঁটে এসে হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। যাহোক ১৯৬৫ সনে তিনি ওয়াকফ করেন। ১৯৬৭ থেকে ২০০৮ সন পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছর সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন জামা'তে দায়িত্ব পালন করেন। শত শত ছেলেমেয়ে এবং নারী-পুরুষকে তিনি কুরআন পড়িয়েছেন। তাঁর তবলীগি প্রচেষ্টা এবং দোয়ার কল্যাণে বহু পুণ্যাত্মা মানুষ আহমদীয়াতের কোলে আশ্রয় নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা এবং তিন পুত্র রয়েছে। তার এক পুত্র আব্দুল হাদী তারেক সাহেব, তিনি মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে ঘানায় কর্মরত আছেন আর সেখানে তিনি জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালএ সাত বছর যাবৎ শিক্ষক হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিজ পিতার জানাযা এবং দাফনেও তিনি অংশ নিতে পারেন নি। তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রও মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং তিন দৌহিত্র কুরআনের হাফেয।

আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মাগফুর আহমদ মুনীব সাহেব, বর্তমানে যিনি কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী এবং মোয়াল্লেমদের জন্য নিঃসন্দেহে এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। স্বল্পভাষী, দৃষ্টি সংযতকারী, নিজ কাজে মগ্ন, দোয়ায় অভ্যস্ত, বিনয়ী, হাসিমু খে সাক্ষাৎকারী, আহমদীয়া খিলাফতের জন্য আত্মাভিমানী, অসন্তুষ্ট হলেও বোঝানোর সময় মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতেন এবং খুবই স্বল্পে তুষ্ট একজন মানুষ ছিল। যেসব ছেলেমেয়ে মৌলভী সাহেবের শিষ্য ছিল, তারা এখন বড় হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের হৃদয় থেকে মৌলভী সাহেবের উত্তম আচরণ এবং ভালোবাসার স্মৃতি এখনো মুছে যায় নি। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান এবং বংশধরকেও তার গুণাবলী ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা হলো নারোয়াল জেলার এধীপুর নিবাসী বশীর আহমদ ডোগর সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া রফিকা বিবি সাহেবার। তিনি ২২ মে তারিখে ঐশী নিয়তির অধীনে মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**। তাঁর বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা গ্রাম প্রধান হযরত মালেক সরদার খান ডোগর সাহেবের মাধ্যমে, যিনি সাহাবী ছিলেন। তার পুত্র রিয়াজ আহমদ ডোগর সাহেব বলেন, যখন থেকে বুঝতে শিখেছি (তখন থেকেই) তাকে আমি অত্যন্ত নামাযী এবং পুণ্যবান দেখতে পেয়েছি। নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, বহু সূরা তার মুখস্থ ছিল, সকালে দুধ দোহনকালে অধিকাংশ সময় সূরা তাগাবূন তিলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঁচ বেলার নামায আদায় করতেন। প্রত্যেক নামাযের পূর্বে দু'একজন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে অবশ্যই নিজের সাথে দাঁড় করিয়ে নিতেন যেন শিশুদের মাঝেও নামাযের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নামাযের পর জায়নামাযে বসে দীর্ঘক্ষণ তসবীহ্ যপ করতেন। অনুরূপভাবে উচ্চৈস্বরে তিলাওয়াত করতেন আর পুরো বাড়ি জুড়ে তার তিলাওয়াতের শব্দ গুঞ্জরিত হত। বহু সূরা তার মুখস্থ ছিল। খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার সম্পর্ক এবং নিষ্ঠা ছিল আর যুগ খলীফার দোয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মানুষকে তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতেন, আমার পুত্রও মুরব্বী আর আমার পৌত্রও মুরব্বী হচ্ছে, এছাড়া আমার এক দৌহিত্রও মুরব্বী। সন্তানদের কথা অনেক বেশি স্মরণ করলেও পাশাপাশি তিনি বলতেন, আমার প্রতি খোদা তা'লার অনেক কৃপা। কেননা তিনি আমার শাখাপ্রশাখা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃত করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ছয় পুত্র ও এক কন্যা এবং পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার এক পুত্র রিয়াজ আহমদ ডোগর সাহেব তানজানিয়ায় জামা'তের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন আর তিনিও বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার দরুণ তার জানাযা এবং দাফনে অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। তার এক দৌহিত্র আদীব আহমদ ডোগর সাহেব পাকিস্তানে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন। এক পৌত্র স্নেহের আইয়্যায আহমদ ডোগর ঘানার জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর দরজায়ে খামেসা অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার পরবর্তী প্রজন্মকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে আজ আমি তাদেরকেও জানাযায় অন্তর্ভুক্ত করব যাদের স্মৃতিচারণ বিগত খুতবাগুলোতে করেছি, কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতির কারণে শুধু জানাযা পড়ানো হয় নি। তাদের মাঝে রয়েছেন নাসের সাঈদ সাহেব, গোলাম মুস্তফা সাহেব, ইসলামাবাদের ডাক্তার নকী উদ্দিন সাহেব এবং ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী যুলফিকার সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার সাথে মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন। (আমীন)

****

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur,MSD.

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

স্থানীয় পত্রিকা ডি.এন.এ মসজিদের উদ্বোধন প্রসঙ্গে এই সংবাদ প্রকাশ করে,

'ভালবাসা সকলের তরে' বাণী দ্বারা মসজিদ সকলকে আহ্বান করছে। তিন বছরের নির্মাণ কার্যের পর জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা হার্টিগহেম এ নির্মিত একটি নতুন মসজিদে নামায পড়বে, যদিও গ্রামবাসীদের কিছু অংশের পক্ষ থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। এটি কোচেনবার্গের প্রথম মসজিদ, যার উদ্বোধন নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

হার্টিগহেম গ্রামে প্রবেশ পথেই ভুট্টা ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি নয়নাভিরাম মসজিদ তৈরীর হয়েছে, যেটি তৈরী করেছে জামাত আহমদীয়া। প্রায় ১৩০জন সদস্য স্ট্রাসবার্গের জামাতে বসবাস করেন। এর আগে তারা এক ব্যক্তির বাড়িতে একত্রিত হয়ে নামায পড়তেন, এখন মসজিদে এসে নামায পড়বেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আল জেরিয়া, পাকিস্তানে নির্যাতনের শিকার আহমদীদেরকে খুব সতর্কভাবে সেখানে থাকতে হয়।

হার্টিগহেমে জামাত আহমদীয়া নিজেদের প্রথম এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় মসজিদ তৈরী করেছে। প্রথম মসজিদটি সেন্ট প্রিক্স-এ অবস্থিত। তৃতীয় মসজিদটি বেউভ্রাগেসে নির্মাণাধীন রয়েছে।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব আশফাক রাব্বানী বলেন, 'আমরা আরও অনেক জায়গা দেখেছিলাম, প্রায় ক্রয় করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানকার মেয়র আমাদেরকে স্বীকার করেছেন, অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, 'আমরা মসজিদ তৈরী করি জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের প্রয়োজন ও সংখ্যা অনুসারে। এখানে ৫টি বিভিন্ন জাতির আহমদীরা বাস করছেন যাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই আমাদের জন্য এই মসজিদটির প্রয়োজন ছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষ ইউরো ব্যয় হয়েছে নির্মাণ কার্যে যা সম্পূর্ণভাবে জামাতের সদস্যরাই দান করেছেন। নামাযের জন্য নির্মিত হলঘরটি ১৫৪ বর্গমিটার, যেখানে আড়াইশো ব্যক্তির স্থান সংকুলান হবে। দুটি অফিসঘর, লাইব্রেরী এবং একটি ছোট্ট রিসেপশন হল রয়েছে। ষাটটি গাড়ির পার্কিং এর ব্যবস্থা এখানে হতে পারে। মসজিদ সংলগ্ন একটি ঘর আছে যেটি মুরুব্বীর বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আমীর সাহেব আশফাক রাব্বানী বলেন, এটি একটি মসজিদ, যেভাবে মেয়র সাহেব চাইছিলেন, সেভাবেই তৈরী হয়েছে, যা পরিবেশগত দিক এবং ঐতিহ্যগত নির্মাণ শৈলীর বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে।

হার্টিগহেমের মেয়র সাহেব বলেন, অনেকে আমাকে বলেছেন এবং আপনাদের প্রতি আমার সদয় আচরণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন, এদের মধ্যে শহরের বাইরের মানুষও রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই মসজিদ সব সময় দেশের আইন অনুসারে রয়েছে এবং থাকবে। আপনাদের এখানে আসা সাত বছর হয়েছে, আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন, নতুন বছর উপলক্ষ্যে রাস্তা পরিস্কার করেন। আপনারা নিজেদের এই কাজ অব্যাহত রাখুন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এলাকায় মসজিদকে স্বীকার করে নিতে একটু সময় লাগবে। কোশারবার্গ এর সদর বলেন, প্রথমে আমি এই প্রকল্পের বিরোধীতা করেছিলাম। কিন্তু যখন আপনাদের 'ভালবাসা সকলে তরে'-স্লোগানটি আমার সামনে এল, তখন আমি চিন্তা করলাম যে আজকের পৃথিবীতে এত উৎকৃষ্ট স্লোগান দেওয়া সত্ত্বেও তাকে বরণ না করে কিভাবে থাকা যায়? তিনি ঘটনাটিকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা নামে অভিহিত করেছেন।

এই সবের উত্তরে খলীফা সাহেব বলেন, 'ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রতি সেভাবেই যত্নবান হতে , যেভাবে আমরা নিজ আত্মীয় স্বজন এবং পিতামাতার প্রতি যত্নবান থাকি। যে সমস্ত সদস্য আমাদের মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন, তারা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। তাঁদের সেবা করে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাাহুদ তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের হুযুর আনোয়ার বলেন-

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সব সময় শান্তিতে রাখুন। আজ জামাত আহমদীয়া এই সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানটি এজন্য করছে কেননা এই শহরের তারা একটি মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করেছে। এটি জামাত আহমদীয়ার জন্য একটি নির্ভেজাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর আনন্দের কারণ। কিন্তু আমি এ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে এই শহরের মানুষ অত্যন্ত উদারমনা এবং উন্মুক্ত চিন্তাধারা অধিকারী। তাঁরা জামাত আহমদীয়া মুসলেমার মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সম্মত হয়েছেন, যেটি কিনা তাদের উপাসনাগার নির্মাণের কাজ শেষ হওয়া এবং এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করেছেন, আর আপনাদের অধিকাংশ যে মুখগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা একথার প্রমাণ যে আপনারা এই শহরের বাসিন্দারা অত্যন্ত উদার মনের।

মসজিদের নাম শুনে অনেক সময় মানুষের মনে অজানা আশঙ্কাও উঁকি দেয়। যদিও এই শহরে বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস, বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ও রয়েছে এখানে, তাসত্ত্বেও অমুসলিম দেশসমূহে মুসলমানদের সম্পর্কে সংশয় মাথাচাড়া দিয়েই থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এমন একটি স্থান লাভ করা যেখানে আমরা ইবাদত করতে পারি, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে এক খোদার ইবাদত করতে পারি। পশ্চিমি ও অমুসলিম বিশ্বের কিছু মানুষ মনে করে যে, মসজিদ হয়তো কোনও ষড়যন্ত্রের স্থানও হতে পারে। কিছু সন্ত্রাসবাদীরাও আসতে পারে। কিন্তু কুরআন করীম মসজিদের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে তা হল এখানে খোদার ইবাদতের জন্য একত্রিত হওয়া। সঙ্গে তিনিও এও বলেছেন তোমাদের ইবাদতও এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা খোদার অধিকারের পাশাপাশি মানুষের অধিকারও দান করে। এই কারণে কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে সেই সব ব্যক্তির নামায তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিম্বা তাদের ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ যারা অনাথদের প্রতি যত্নবান নয়, যারা মিসকীনদের প্রতি যত্নবান নয়, অভাবপীড়িতদের প্রতি যত্নবান নয় এবং কোনওভাবে মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি যত্নবান নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে একজন প্রকৃত মুসলমান যখন মসজিদের নাম উচ্চারণ করে তখন তার চোখে ভেসে ওঠে এমন এক স্থান যেখানে সে এক খোদার ইবাদত করে, যেখানে গিয়ে সে দোয়া করে এবং আল্লাহ্ তা'লা কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যেন পৃথিবীতে এবং তার নিজের পরিবেশে যেন শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। এই কারণেই আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে মান্য করি, তিনি বলেন, যদি কোনও এলাকায় ইসলামের পরিচিতি ঘটাতে হয় তবে সেখানে মসজিদ তৈরী কর। এখন যদি ইসলামের নাম কোন কুখ্যাত কাজের জন্য ছড়িয়ে পড়ে তাতে কোনও লাভ নেই। যদি ইসলামের এই পরিচিতি তৈরী হয় যে এই মসজিদে লোকেরা সন্ত্রাস ও নাশকতা পরিকল্পনা করছে, তবে এতে কোন লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। পরিচয় তখনই হয়, বা এর খ্যাতি তখনই প্রসার লাভ করে যখন তার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়। এই কারণেই যখন মসজিদ নির্মাণ করা হয় তখন মানুষ আরও বেশি করে দেখে যে এই মুসলমানেরা কেমন। আর প্রকৃত মুসলমানের মসজিদ দ্বারা লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মসজিদে আসা মানুষেরা অন্যদের প্রতি যত্নবান এরা কেবল ইবাদতের জন্যই এখানে আসে না, বরং একে অপরের যত্নও নেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিবেশী সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে যে তোমাদের সঙ্গে সহাবস্থানকারীরা, তোমাদের সফরসঙ্গীরা, সহকর্মীরা, যাদের সঙ্গে তোমাদের ওঠাবসা হয় তারা- এরা সকলেই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। এদিক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যুগ ইমাম-এর বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

থেকে দেখলে এখানে এক হাজারেরও বেশি আহমদী বাস করেন। অতএব প্রায় পুরো শহরটিই আহমদীদের প্রতিবেশীতে পরিণত হয়েছে। যদি তাদের অধিকার দিতে হয়, তবে তাদের অধিকার প্রদানের মান কিরূপ হওয়া উচিত? ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন, ' আমাকে খোদা তা'লা প্রতিবেশীর অধিকারের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে, আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছে উত্তরাধিকার সম্পদেও হয়তো প্রতিবেশীদের অধিকার রয়েছে, যেভাবে আত্মীয়-স্বজন বা রক্তের সম্পর্কের উত্তরাধিকারী সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই প্রতিবেশীর অধিকার দিতে হবে- এটিই প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের মান।' অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের নিজের ধর্মের শিক্ষার উপর আমল করার মাধমে ইবাদতের জন্য মসজিদের আসার সময় এই বিষয়টি চিন্তা করা এবং এর উপর আমল করা উচিত।

এখানে আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব একথার উল্লেখ করেছেন যে, এই শহরে হ্রদও আছে, পানির উৎস আছে। এমনিতেও এই সব উন্নত দেশগুলিতে যেখানে আপনারা বাড়িতে যখনই পানির ট্যাপ চালু করেন, পানির প্রবাহ আরম্ভ হয়ে যায়। তাই আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না যে যেখানে পানীয় জলের সংকট আছে, সেখানে তাদের কি দুর্গতি হয়। আফ্রিকাতে অনেক এলাকা এমন আছে, প্রায় ৮০ শতাংশ এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে পানি সহজলভ্য নয়। ৬-৭ বা ১০ বছরের শিশুরা ছোট ছোট বালতি বা বড় বালতি মাথায় করে নিয়ে ২-৩ কিমি পায়ে হেঁটে গিয়ে পানি নিয়ে আসে। তাদের দিনের অধিকাংশ সময় এই কাজেই ব্যয় হয়। যে কারণে তারা শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকে।

আমীর সাহেব এই শহরের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে এখানে শিক্ষার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

এখন সেই সব লোকেরা কেবল পানি থেকেই বঞ্চিত নয়, বরং কয়েক কিমি পায়ে হেঁটে দুষিত জলাশয় থেকে পানি নিয়ে আসে। সেই জলাশয় থেকে জীবজন্তুরাও পানি খাচ্ছে। আর সেই পানিই শিশুরা বয়ে আনছে যা তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়। এত দূরের সফর এবং দারিদ্রের কারণে তারা শিক্ষাও অর্জন করতে পারে না। এই দেশগুলিতে জামাত আহমদীয়া মসজিদ তৈরী করে, যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে শিক্ষার্জনের জন্য স্কুলও তৈরী করে, পানির জন্য হ্যান্ডপাম্প এবং সৌরবিদ্যুত চালিত পাম্পও বসানো হয়। আমি প্রায় সময় একথা শুনিয়ে থাকি যে সৌরবিদ্যুত চালিত পাম্প থেকে যখন ভূগর্ভের জল উঠে আসে, তখন সেখানকার মানুষ ও শিশুদের চোখেমুখে যে আনন্দ ফুঠে ওঠে তার তুলনা হতে পারে ইউরোপের সেই ব্যক্তির সাথে যে কয়েক কোটি টাকার লটারি পেয়ে আনন্দ উদযাপন করে।

জামাত আহমদীয়া যেখানে যেখানে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে এই ধরণের সুযোগ সুবিধাও দিয়ে থাকে। আমাদের শত শত স্কুল, হাসপাতাল, পানীয় জলের প্রকল্প, আদর্শগ্রাম প্রকল্প সেখানে অব্যাহত আছে যেখানে আমরা সেবামূলক কাজ করে থাকি। আর এই সুযোগ সুবিধা কেবল আহমদীদের জন্যই নয়, সেবামূলক এই সমস্ত কাজে, যেমন আমাদের ক্লিনিকে আগত রুগী, স্কুলে পাঠরত ছাত্রদের ৮০ শতাংশই অমুসলিম। তাই আমরা কোন ভেদাভেদ না রেখেই সেবা করে চলেছি। সেখানকার স্থানীয় আহমদীরা মসজিদেও আসেন আর এই কারণে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা। মানবসেবার যে সমস্ত কাজ এখানে হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু সম্মানীয় অতিথিও এই সব সেবামূলক কাজের উল্লেখ করে বলেছেন, দারিদ্রক্লীষ্ট এই সব দেশে তারা পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছেন। আমরা যেখানেই থাকি, এই ধরণের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি আর এটিই জামাত আহমদীয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমি আশা করি মসজিদ নির্মাণের পর বছরের শুরুতে কিম্বা অন্যান্য সময়ে এই জামাতের মানুষ যে সমস্ত সেবামূলক কাজ করেছে, এখন এই মসজিদটি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আগের চাইতে আরও ভালভাবে কাজ করবে এবং মানুষকে দেখাবে যে প্রকৃত ইসলাম হল যেখানে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, অপরদিকে আল্লাহ্ সৃষ্ট মানুষের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের প্রথম সূরার প্রথম নির্দেশ হল, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কর যিনি সমগ্র জগতের প্রভুপ্রতিপালক। তিনি ইহুদীদেরও প্রভুপ্রতিপালক, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সকলের প্রভু প্রতিপালক। এই কারণেই ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) সব সময় মানবীয় সহানুভুতি ও মূল্যবোধকে দৃষ্টিতে রেখেছেন। এই জন্য কুরআন করীমও তাঁকে সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ নামে অভিহিত করেছে। অনেকে বলে, ইসলাম চরমপন্থার ধর্ম, উগ্রবাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইসলাম কখনই উগ্রবাদের শিক্ষা দেয় নি। ইতিহাসের উপর ন্যায়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) প্রারম্ভিক মক্কার ১৩ বছর চরম অত্যাচার এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি তাদের কোনও উত্তর দেন নি। সেই অত্যাচারের কারণে, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সেখান থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। মদীনায় আসার পর সেখানেও মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি, আক্রমণ করে বসেছে। কুরআন করীমে যুদ্ধ করার বা কঠোর পদক্ষেপ করার প্রথম আদেশ সেই সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন তাঁরা মদিনা হিজরত করে গেছেন। কুরআন করীমের ২২ নং সূরায় এই আদেশ আছে যে, এখন এই সব অত্যাচারীদেরকে উত্তর দেওয়া জরুরী, কেননা তাদেরকে যদি উত্তর না দেওয়া হয়, তবে কেবল মুসলমানদেরকেই তারা শেষ করে ক্ষান্ত হবে না। কুরআন করীমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা ধর্মের শত্রু। এদের আক্রমণ থেকে কোনও সিনাগগ, গীর্জা, মন্দির বা মসজিদ কিছুই নিরাপদ থাকবে না। অর্থাৎ এই আদেশ দ্বারা কুরআন করীম শুধু একথা বলে নি যে তোমরা নিজেদের মসজিদকে রক্ষা কর বা নিজেদের ধর্মকে রক্ষা কর, বরং বলা হয়েছে যে এরা ধর্মের শত্রু যারা কোনও ধর্মকেই জীবিত রাখবে না। তাই এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা জরুরী। তাই মুসলমানেরা তাদেরকে উত্তর দিয়েছে মাত্র। কেননা খোদা তা'লার সাহায্য তাদের সঙ্গে ছিল, এই কারণেই মক্কা থেকে আগত সৈন্যরা সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও সংখ্যায় তাদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ প্রায় নিরস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে পর্যদুস্ত হয়েছিল। এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ আর এই ছিল যুদ্ধের পৃষ্ঠভূমি। আর এই ছিল কুরআন করীমের আদেশ যে কি কারণে মুসলমানদের এখন আদেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানেও লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) সেই সমস্ত মানুষের সামনেও উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে তিনি (সা.) শিক্ষিতদেরকে মুসলমানদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়ার শর্তে মুক্তি দান করেন, কেননা শিক্ষা এমন বিষয় যা মানুষের অর্জন করা উচিত। মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি নিজ প্রাণের শত্রুদের প্রতিও এমন সদয় আচরণ করলেন যাতে মানুষ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়, জ্ঞানের প্রসার হয় এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) যখন মক্কায় ছিলেন, তখন সেখানকার প্রমুখ নেতারা (তিনিও একজন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন) একটি কমিটি গঠন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল অসহায় ও অভাবপীড়িতদের সাহায্য করা। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নবুয়তের দাবি করলে কাফেরদের বড় নেতারা তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে। কিন্তু দরিদ্রদের সেবার বিষয়ে তিনি এতটাই সচেতন ছিলেন যে, মদীনায় আসার পরও যখন দরিদ্রদের সাহায্য করার বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ ওঠে যে সেবামূলক কাজ কিভাবে সুসংহত ও সুসংগঠিতভাবে করা যায়, কিভাবে গরীবদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করা যায়, তখন তিনি (সা.) বললেন, সেই সব মানুষ, যাদের সঙ্গে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম, যাদের সঙ্গে মিলে আমরা একটি কমিটি গঠন করে গরীবদের সাহায্য করতাম, তারা যদিও আমার বিরোধী, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা নবুয়তের মর্যাদা দান করেছেন, অনেক মানুষ আমার অনুসারী আর আমি মদীনায় প্রাশাসনিক প্রধানের ভূমিকায় আছি, এতদ্সত্ত্বেও তারা যদি আমাকে আজও আহ্বান করে তবে মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে আমি একজন সদস্য হিসেবে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। তবে কোনও পদাধিকারী হিসেবে নয়। এই ছিল তাঁর পদমর্যাদা, তার হৃদয়ের কোমলতা। কিভাবে তিনি সেই এলাকায় মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেও কাজ করেছেন? পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে এখানে অনেক বিতর্ক হয়। সমন্বয় তো তখনই হয় যখন অপরের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। একস্থানে তিনি (সা.) বসে ছিলেন, সেই সময় সেখান দিয়ে একটি শিশুর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত মহম্মদ (সা.) উঠে দাঁড়ালেন আর তাঁর সঙ্গীরা বসেই থাকলেন। তারা বলল, এটা তো একজন ইহুদী শিশুর জানাযা, তবুও আপনি তার সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন! একথা শুনে তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, এই ইহুদী শিশুটি কি মানুষ ছিল না? আমি এজন্য দাঁড়িয়েছি যে আমাদেরকে মানবীয় মূল্যবোধ অনুধাবন করতে হবে। মানবীয় মূল্যবোধ অনুধাবনের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত ভালবাসার প্রসার করতে পারব, সমাজে সম্প্রীতি আনতে পারব এবং শান্তি, সৌহার্দ্য ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় রাখতে পারব। এই ছিল তাঁর আবেগ অনুভুতির সূক্ষ্মদৃষ্টিকোণ।

সমন্বয় সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়, যা খুব ভাল কথা। আমিও বলে থাকি যে এই সমন্বয় আসলে কি? আমার জন্য সমন্বয়ের অর্থ, এখন যেমন এখানে যে সব আহমদীরা এসেছেন, তাদের অধিকাংশ অভিবাসী, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এখানে এসেছেন। তাই তাদের জন্য সমন্বয় হল এই শহরের উন্নতির জন্য নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করা, এখানে শিক্ষা অর্জন করে এদেশের সেবা করা, সমাজের সেবা করা এবং তাদের উন্নতির জন্য কাজ করা। সরকারের উপর বোঝা না হয়ে, কাউন্সিলের উপর বোঝা না হয়ে চেষ্টা করুন যাতে আপনারা নিজেরাই বেশি করে তাদের সেবা করতে পারেন। এই কারণেই জামাত আহমদীয়া তার সদস্যদেরকে এই বিষয়েরই উপদেশ দিয়ে থাকে যে তোমরা চেষ্টা কর উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এদেশের সেবা করবে। এর ফলে একদিকে যেমন তোমাদের উপকার হবে, অপরদিকে এদেশেরও কল্যাণ হবে।

এই কারণে আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করি, যাতে তারা এই সমাজ ও দেশের সেবা করতে পারে, যেখানে তারা এসে আশ্রয় নিয়েছে। এটি এদেশের বিরাট অনুগ্রহ যে তারা এদেরকে এখানে আশ্রয় দিয়েছে আর নিজেদের দেশে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে ইবাদত করতে পারত না, এখন এই দেশ এখানে তাদেরকে ইবাদত করার সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। এই অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা এই দেশের জন্য পূর্ণ সততা এবং নিজেদের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং দেশের সেবা করব। আর এটিই হল প্রকৃত সমন্বয়। যতদিন আমাদের এই চিন্তাধারা থাকবে, আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ জামাত আহমদীয়ার সুনামও বজায় থাকবে। আর আপনারাও অনুভব করবেন যে, জামাত আহমদীয়ার মসজিদ কোনও কলহ ও বিশৃঙ্খলার স্থান নয়, বরং এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পর আহমদীদের সেবার প্রেরণা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জানতে পেরেছি যে, আমাদের লর্ড মেয়র সাহেব এই এলাকাতেই থাকেন যেখানে মসজিদ অবস্থিত। তিনি অনেক প্রশংসাও করেছেন যে আহমদীরা সমাজে অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে সমন্বিত থাকেন আর দ্বিতীয়ত তাদের সমন্বয় কাউন্সিল এর যে প্রতিনিধি এখানে এসেছিলেন, তিনিও একথা বলেছেন। তাই আমি এখন আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর এখন পূর্বের থেকেও বেশি নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে এই শহরের মানুষের সেবা করুন এবং দেশের সেবা করুন এবং প্রমাণ করুন যে, আমরা শান্তির পরিবেশে থাকতে চাই।

ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কুরআন করীম দ্বিতীয় সূরাতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, ধর্মের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুসারে ধর্ম অবলম্বন করতে পারে। কাজেই একজন মুসলমানের মনে এমন চিন্তার উদ্রেক মোটেই হওয়া উচিত নয় যে সে জোর করে কাউকে মুসলমান বানাবে, কিম্বা কোনও অমুসলিমের জন্য তার মনে কোন আবেগ অনুভুতি না থাকা কখনই কাম্য নয়। আসল বিষয় হল মানবীয় মূল্যবোধ। আমরা যদি এই মানবীয় মূল্যবোধকেই রক্ষা করতে সক্ষম হই তবে সমাজে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর ধর্মমতের উর্দ্ধে এখন এটিই এযুগের প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে আমাদের একমাত্র পরিচয়, আমরা মানুষ। যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, খোদা তা'লা আমাদেরকে প্রথম সূরাতেই বলেছেন, তিনি রাব্বুল আলামীন, অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সকলের জন্য তিনি প্রভু প্রতিপালক এবং প্রত্যেকের প্রতি দয়াবান। এমনকি যারা ধর্ম মানে না, খোদাকে অস্বীকার করে, তিনি তাদেরও খোদা, তাদেরকেও অযাচিতভাবে সব কিছু দান করছেন। আর অন্যান্য যারা ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন মেনে চলে না কিম্বা খোদার স্থানে অন্য কাউকে দাঁড় করিয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি তাদের শাস্তি পরকালে বা পরকালের জীবনে দেওয়া হবে, ইহ জগতে নয়। আর এই জগতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন প্রত্যেকের প্রতি সদয় ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করি। কুরআন করীমে এতদূর পর্যন্ত লেখা আছে, ধর্মীয় বিষয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে তোমরা কারোর প্রতিমাকেও মন্দ বলো না। কেননা এর প্রত্যুত্তরে তারাও তোমাদের খোদাকে গালমন্দ করবে। এর মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গালাগালি আরম্ভ হয়ে যাবে আর আর শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশ বজায় থাকবে না। তাই কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সর্বত্রই দেখা যাবে এর মধ্যে নমনীয়তার শিক্ষাই রয়েছে। সেগুলি মেনে চলা উচিত আর এটিই জামাত আহমদীয়ার শিক্ষা। সারা বিশ্বে ইসলামের এই শিক্ষাই আমরা প্রচার করছি এবং এর আমল করার চেষ্টা করছি। যেমনটি আমি বলেছি, আমি আশা করি আমাদের এখানে বসবাসকারী আহমদীরা মসজিদ তৈরীর পর আগের থেকে বেশি সক্রিয়ভাবে এই শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করবে। এবং এই শহর ও এলাকায় ইসলামের সম্প্রীতিপূর্ণ শিক্ষা এবং সঙ্গী সাথীদের প্রতি আচরণে পূর্বের থেকে বেশি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সেই তৌফিকও দান করেন। ধন্যবাদ।

১৪ই অক্টোবর, ২০১৯

প্রেস কনফারেন্স, উইযবাদান

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'আপনি উইযবাদন শহরে দ্বিতীয়বার এসেছেন। আমি জানি না, আপনি কতটুকু এই শহর ঘুরে দেখেছেন, কিন্তু আপনাকে এই শহরটি কেমন লেগেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ততটা ঘুরে তো দেখি নি, কিন্তু মসজিদ আসার সময় অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায়। এটি অনেক বড় এবং সুন্দর শহর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে , 'আপনি ভীতি এবং অশান্তির বিরুদ্ধে সরব থেকেছেন। মানুষের প্রতি আপনার বার্তা কি?' এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: লোকেদের উদ্দেশ্যে আমি বার্তা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। আমি নিজের বক্তব্যে বলেছিলাম, মানুষের মধ্যে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে রক্ষণশীল ধারণা কাজ করে। এর কারণ মুষ্টিমেয় মুসলমানের অনুচিত কার্যকলাপ। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ আর নিরপরাধ মানুষের উপর এই ধরণের অত্যাচার করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ইসলাম আমাদেরকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে নেওয়ার অনুমতি দেয় না। আমরা একটি শান্তিপ্রিয় জামাত, যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলে। তাই আমার বার্তা হল এই শহর, কসবা বা এলাকার মানুষের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আহমদী মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে কোনও প্রকার সংশয় ও রক্ষণশীলতা থাকা উচিত নয়। আমরা একটি শন্তিপ্রিয় জামাত। আর আমাদের শান্তিপ্রিয় হওয়ার কারণ আমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করি।

একজন প্রতিনিধি বলেন, 'আমি জানতে চাই যে, আপনার বক্তব্য বিশেষ করে জার্মানীর মানুষের জন্য ছিল, কেননা এদেশে এমন অনেক ঘটনা ঘটছে। গত সপ্তাহে এক ব্যক্তি ইহুদী উপাসনাগারে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। আপনি কি নিজের বক্তব্যে বিশেষ করে জার্মানদেরকে দৃষ্টিপটে রেখেছিলেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, না, না, এমনটি নয়। আমি বক্তব্যের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতি নিই নি। আমি কেবল ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি মাত্র। কেবল এখানেই নয়, বরং সমস্ত অমুসলিম দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা পাওয়া যায় যে মুসলমান মাত্রই অত্যাচারী। তাদের ধারণা, মুসলমানেরাই জিহাদের নামে অত্যাচার, বর্বরতা, খুনোখুনি করে চলেছে। আমি যেখানেই গিয়েছি, আমি এই জিনিসটিই দেখেছি। তাই বিশেষ করে জার্মানদেরকে লক্ষ্য করে একথা আমি বলি নি। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের ভীতি দূর করার চেষ্টা করে থাকি। আমি তো বক্তব্য রাখার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বলতে থাকি এবং পরে মানুষের সেই ভীতি দূর করার চেষ্টা করি যা তাদের মনে বদ্ধমূল আছে। এটি যথারীতি প্রস্তুত করা কোনও বক্তব্য ছিল না, আর আমি জার্মানদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনও বার্তা দিব বলেও আমার মাথায় ছিল না। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করেছি মাত্র এবং

যুগ খলীফার বাণী

"আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।" (২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

"খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 20Aug, 2020 Issue No.34

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমাদের ঈমান এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে বলেছি।

অপর এক প্রতিনিধি বলেন, 'আমি জানি না আপনি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইবেন কিনা, কিন্তু গত সপ্তাহে তুর্কি সিরিয়ার কিছু অংশের উপর আকাশপথে আক্রমণ করেছে। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কুর্দ এবং তুর্কী সরকারের মাঝে সাম্প্রতিক তিক্ততা এবং এই পদক্ষেপ আমার দৃষ্টিতে অত্যাচারপূর্ণ। । আমি জানি না এর কারণ রাজনৈতিক না কি তুর্কীদের মনে কুর্দদের বিরুদ্ধে বৈরিতা। কিন্তু যা কিছু হচ্ছে তা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার নামান্তর। তাই আমি এটি পছন্দ করি না। কুর্দ এবং তুর্কীদের মাঝে যে বিবাদই থাকুক না কেন, বসে আলোচনার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তুর্কী এখন যেভাবে আকাশপথে এবং স্থলসেনা দ্বারা আক্রমণ করেছে, ইসলাম কখনই এর অনুমতি দেয় না।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে বলেছেন। আপনার দৃষ্টিতে ইন্টিগ্রেশন কি আর এ ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের লক্ষ্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: লোকেরা এদেশে হিজরত করে এসেছে। এখানকার মানুষ এবং জার্মান সরকার তাদেরকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছে, এখানে থেকে জীবন যাপন করার অনুমতি দিয়েছে। তাদেরকে সমাজের অংশ করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই তো এখন জার্মানীর নাগরিকত্ব অর্জন করেছে। এখন তারা যেহেতু এদেশের নাগরিক, তাই তাদেরকে তেমনভাবেই থাকা উচিত যেভাবে কোনও দেশের একজন বিশ্বস্ত নাগরিক হয়ে থাকে। 'হুব্বুল ওয়াতিনি মিনাল ঈমান'- এটিই ইসলামের শিক্ষা, যার অর্থ দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ। তাই একজন প্রকৃত মুসলমান ও জার্মান নাগরিক হওয়ার কারণে এই সমাজ ও দেশের উন্নতির ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করা তাদের কর্তব্য। আমার মতে এটিই প্রকৃত ইন্টিগ্রেশন বা সমন্বয়। সমন্বয়ের অর্থ এই নয় যে ক্লাবে যেতে হবে, আর ক্লাবে যদি না যায়, সেখানে মদপান না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমন্বয় হবে না। কিম্বা যদি পর্দা করে তাতে সমন্বয়ে বাধা সৃষ্টি হবে। আপনি যদি দেশ ও

১ম পাতার পর.....

বিরোধীদের অনুরূপ অবস্থা। খ্রীষ্টান লেখকেরা কুরআন করীমের উপর ক্রমাগতভাবে আপত্তি করতে থাকে, কিন্তু কুরআন করীমের অনুরূপ কোনও গ্রন্থ উপস্থাপন করার দাবি মেটানোর ধৃষ্টতা তারা আজও দেখাতে পারে নি। তারা বলে, কুরআন করীম ইঞ্জিলে অমুক বিষয়টি চুরি করেছে। তওরাত থেকে অমুক বিষয়, আর জুরাথিস্থিদের গ্রন্থ থেকে অমুক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইঞ্জিল, তওরাত এবং জারদাস্তি গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু নকল করে নিজেরাই কুরআন করীমের ন্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করার সাহস দেখাতে পারে না। মধু সম্পর্কে মানুষ আপত্তি করতে পারে যে মৌমাছিরা ফুল থেকে সুগন্ধ ও ফল থেকে মিষ্টতা চুরি করেছে। কিন্তু এমন ব্যক্তির কথাকে তখনই আমল দেওয়া যেতে পারে যখন সে নিজে অনুরূপ মধু তৈরী করে দেখাবে। উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনে নতুন এবং উৎকৃষ্টতর বস্তুতে পরিণত করাও তো এক প্রকার অলৌকিক বিষয়। এটি যদি সহজ বিষয়ই হয়, তবে আপত্তিকারী নিজেই কেন এমন কাজ করে দেখায় না? কিন্তু এই উত্তর প্রতিআক্রমণ হিসেবে দেওয়া হল। অন্যথায় কুরআন করীমের দাবি, এর মধ্যে সেই সকল সত্যও বিদ্যমান যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (আল বাইয়েনাহ) এর মধ্যে সেই সকল চিরন্তন সত্য বিদ্যমান যেগুলি যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে বিলোপযোগ্য ছিল না। অতঃপর তিনি বলেন, وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (আল বাকারা: রুকু-৮)

যুগ ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।"

(খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

[সৌজন্যে: নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান]

অর্থাৎ এই রসূল তোমাদেরকে সেই সব কিছু শেখায় যা তোমরা পূর্বে জানতে না। অর্থাৎ এই রসুলের শিক্ষা কেবল সেই সব উৎকৃষ্ট শিক্ষামাল সংবলিত নয় যা পূর্বের গ্রন্থসমূহে ছিল, অধিকন্তু এর মধ্যে সেই সব বিষয়ও রয়েছে যা সম্পর্কে পৃথিবী পূর্বে জানত না। অনুরূপভাবে বলেন, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (বাকারা, রুকু-৩১) অর্থাৎ তোমরা যখন শান্তির অবস্থায় থাক তখন আল্লাহ্‌র সেই সকল গুণাবলীকে স্মরণ কর যা তিনি এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং যেগুলি সম্পর্কে পূর্বে তোমরা অবগত ছিলে না। এই গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে কুরআন করীমে ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে এমন সব অতিরিক্ত জ্ঞান দান করা হয়েছে যা পূর্বে পৃথিবীতে ছিল না।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৬)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১০ই জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)
হুযুর আনোয়ারের ইউরোপ সফরের রিপোর্ট

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir